

ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির
তুলনামূলক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে
এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত

নাজনিন ই ফিরদৌস

রেজি. নং – 124445 of 2013-2014

রোল নং – MPPH194014

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০ ০৩২

২০১৮-২০১৯

Certified that the thesis entitled, 'ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পর্যালোচনা', submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar at **Jadavpur University**, thereby fulfilling the criteria for submission, as per M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Naznin E Firdaus, 14.5.2019

Name of the M.Phil Student

Exam Roll No - MPPH194014

Registration no - 124445 of 2013-14

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Naznin E Firdaus** entitled 'ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পর্যালোচনা', is now ready for submission towards the parital fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University.

P. Sarkar

Head

Department of.....

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Naznin E Firdaus
14/05/19

Supervisor & Convener

of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Preetam Ghoshal
14.5.19

Member of RAC
PREETAM GHOSHAL
Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University

Certified that the thesis entitled, 'ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পর্যালোচনা', submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar at **Jadavpur University**, thereby fulfilling the criteria for submission, as per M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Name of the M.Phil Student

Exam Roll No - MPPH194014

Registration no - 124445 of 2013-14

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Naznin E Firdaus** entitled 'ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পর্যালোচনা', is now ready for submission towards the parital fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University.

Head

Department of.....

Supervisor & Convener

of RAC

Member of RAC

প্রাক্কথন

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত আলোচনাটি সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্যের প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের আলোচনা এবং প্রাচ্যের প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মনু ও কৌটিল্যের আলোচনা থেকে শুরু করে সমসাময়িককাল পর্যন্ত দর্শনের পরিমন্ডলে ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করলেও, 'ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনাটি' বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে ন্যায়বিচারের আলোচনাটি শুধুমাত্র কোন বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানারকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ, অন্যায় আচরণের ফলে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক পর্যালোচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম. ফিল উপাধির জন্য এই গবেষণামূলক নিবন্ধের উপস্থাপন। আমার এই নিবন্ধে বিষয়টি নির্বাচনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই আমার আধ্যাপক সমর কুমার মন্ডল মহাশয়ের। শুধু বিষয় নির্বাচনই নয়, পরবর্তী লেখার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস সাহায্য ও বিষয় সম্পর্কে তাঁর সহজ সরল আলোচনা আমার এই নিবন্ধটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। প্রতিনিয়ত তিনি প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পড়ে তথ্য ও লেখার মান সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য পরামর্শ দিয়ে নিবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমি আমার

বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর স্নেহের অবদানকে ছোট করতে চাই না। কৃতজ্ঞতার মাপকাঠিতে তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য।

সর্বপোরি, আমার পিতা- সেখ রফিক আহমেদ ও মাতা- ফিরোজা বেগম ও শ্রদ্ধেয় পিতামহীর নিকট বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেননা তাঁদের সমস্ত প্রকার ত্যাগ, উৎসাহ, ও আশীর্বাদ ছাড়া আমি এই নিবন্ধটি সম্পন্ন করতে পারতাম না। এবং আমার বোনের ভালবাসা নিবন্ধটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক, তাকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক প্রয়াস সরকার মহাশয়ের প্রতিও আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এই প্রবন্ধটিকে সুস্থভাবে সমাপ্তির জন্য নিজের অমূল্য সময় দিয়ে নানাবিধ সাহায্য করেছেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমার বন্ধু-বান্ধব যারা আমার এই কাজটি করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাবিধ সাহায্য করেছে তাদের প্রতিও আমি বিশেষভাবে ঋণী।

পরিশেষে, একথা বলি যে, আমার স্বল্প জ্ঞানের পরিসর থেকে গবেষণাপত্রটি লেখার সময় আমি আমার সাধ্যমতো যত্ন ও সতর্কতা নিয়েছি, তবুও যদি কোনোরকম কোথাও ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায় নিতান্তই আমার এবং তার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

তারিখ - মে, ২০১৯।

নাজনিন ই ফিরদৌস

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১ - ৪
প্রথম অধ্যায় : ন্যায়বিচারের ধারণা	৫ - ২২
১। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা	৬
২। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আলোচনা	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়বিচার সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের (প্রাচীনযুগ) আলোচনা	২৩ - ৫১
১। ন্যায় সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদের আলোচনা ও খণ্ডন	২৩
২। প্লেটোর ন্যায়বিচারের ধারণা	২৯
৩। অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিচারের ধারণা	৩৬
৪। অ্যারিস্টটল উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার ন্যায়বিচারের আলোচনা	৪৪

তৃতীয় অধ্যায় : ন্যায়বিচার সম্পর্কিত (মধ্যযুগ থেকে

সমসাময়িক) আলোচনা

৫২ - ৭৭

১। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত

সেন্ট অগাস্টাইনের মতবাদ

৫২

২। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সেন্ট টমাস

অ্যাকুইনাসের মতবাদ

৫৬

৩। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কান্টের আলোচনা

৬৫

৪। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত জন রলসের আলোচনা

৭২

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের আলোচনা

৭৮- ১০০

১। মনু উল্লিখিত কর্তব্যকর্ম ও বর্ণশ্রম ব্যবস্থার আলোচনা

৭৯

২। মনু'র আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে

ন্যায়বিচারের আলোচনা

৮৬

৩। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কৌটিল্যের

অর্থশাস্ত্রের গুরুত্ব

৯৩

৪। অর্থশাস্ত্র আলোচনার প্রেক্ষিতে কৌটিল্যের

মতে ন্যায়বিচারের ধারণা

৯৭

পঞ্চম অধ্যায় : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা

১০১ - ১১৩

মূল্যায়ণ

১১৪ - ১১৬

গ্রন্থপঞ্জী

ভূমিকা

ন্যায়বিচার আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও বৈদেশিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবং দর্শনের জগতেও এই আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কারণ দার্শনিকগণ শুধুমাত্র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন না, সামাজিক প্রেক্ষাপটও দার্শনিকদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। ন্যায়বিচার এরকমই একটা সামাজিক সমস্যা যাকে কেন্দ্র করে দার্শনিকগণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ‘ন্যায়-অন্যায়’ বোধের ধারণাও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ কোন কাজকে ‘ন্যায়’ ও কোন কাজকে ‘অন্যায়’ বলা যাবে – এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা খুবই বিতর্কিত একটি বিষয়। এযাবৎ ন্যায়বিচার সংক্রান্ত যেসব ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা। যেহেতু আমার আলোচনাটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেক্ষিতে তাই সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কি বোঝায়? সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় যার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত সকল সদস্যদের মধ্যে ভাল-মন্দ সকল কিছুই বন্টনের দ্বারা সমাজের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। “Social justice is usually thought of in terms of how units or item, whether good or bad should be distributed among members of a society.”¹। সামাজিক ন্যায়ের ধারণা

¹ Jain B. Butts and Karen L. Rich, *Nurishing Ethics ; Across the Curriculum and into Practice* (U.S.A: Jones & Bartlett Learning, 2015), 14.

অনুসারে ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য অনস্বীকার্য উপাদান হল সামাজিক সুযোগ সুবিধা এবং সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ। আর এই সুযোগ সুবিধাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার। সামাজিক ন্যায়কে একটি আদর্শমূলক ধারণা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ এই ধারণায় সমাজের অন্তর্গত সকল জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের চিন্তা করা হয়। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপ, ও অন্যায় আচার-আচরণের ফলে যে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে সমাজের অন্তর্গত সকল জনগণকে যথাযথ সুযোগসুবিধা প্রদানের দ্বারা সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচারের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে আমার গবেষণাপত্রের বিষয়টি নির্বাচন করেছি। আমার আলোচ্য বিষয় হল - ‘ন্যায়বিচারের ধারণা ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক পর্যালোচনা’। সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকগণ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ দিয়ে থাকলেও এবিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় নি। তথাপি এটা মনে হয় যে, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাটি একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখে। এই নিবন্ধে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হয়েছি। এক্ষেত্রে আমার আলোচনার বিষয়বস্তুকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে ন্যায়বিচার নামক ধারণাটির উৎস ও ন্যায়বিচার বলতে সাধারণত কী বোঝায়, এবং সমাজে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সমাজে বসবাসের মাধ্যমে স্ব-ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ সামর্থ্য ও স্বাধীনতা অনুযায়ী তার কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করবে, তখনই সে ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে। এবং এই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারাই সমাজ তথা সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্যের প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলতঃ প্লেটো সমাজের সকল নাগরিকের যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যেখানে অ্যারিস্টটলের মতে, সমাজের সকল সদস্যকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের দ্বারাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়বিচার সম্পর্কে মধ্যযুগ থেকে সমসাময়িক দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, পূর্বসূরী দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আলোচনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালের দার্শনিকদের ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মতবাদ গড়ে উঠলেও বিশেষতঃ মধ্যযুগের দার্শনিকদের আলোচনা ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যদিও পরবর্তীকালের দার্শনিকদের মধ্যে এই দিকটি খুব একটা বেশী গুরুত্ব পায় নি। বিশেষতঃ দার্শনিক কান্টের আলোচনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে, সমসাময়িক দার্শনিক জন্ রলসের আলোচনায় আমরা দেখি যে, সমাজের সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তিনি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষতঃ মনু ও কোটিল্যের আলোচনার ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের ধারণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনাপূর্বক এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সাধারণ ধর্ম, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, রাজধর্ম, এবং আইন ও দণ্ড ব্যবস্থার অনুসরণে সমাজের সকল নাগরিকের মধ্যে সমানাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, ফলে সকল নাগরিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মতবাদের তুলনায় প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়বিচারের ধারণা

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়বিচারের ধারণা

ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার, এবং একটা সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি সমাজ ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি তারও যে কিছু কর্তব্য আছে সে বিষয়ে ব্যক্তিকে সচেতনও করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। W.Vice, James. তাঁর ‘Neutrality, Justice and Fairness’ গ্রন্থে বলেন “In broader sense, Justice is an action in accordance with the requirements of some law. And In narrow sense, justice is fairness. It is an action that pays due regard to the proper interest, property and safety of one’s fellows.”¹। অর্থাৎ ব্যাপকঅর্থে ন্যায়বিচার বলতে আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করাকে বোঝায়, এবং সংকীর্ণ অর্থে ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় সততা বা সুবিচার, যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তার যথাযথ অধিকার ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি কথা বলা আবশ্যিক যে, ন্যায়বিচার নামক ধারণার কোন স্থায়ী সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কারণ প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই

¹ Michelle Maiese, “Principles of Justice Fairness”, University of Colorado, Boulder, 2003, http://www.beyondintractability.org/essay/principles_of_justice. (accessed november 2, 2018).

ধারণাটা প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ন্যায়বিচারের ধারণাটা সর্বপ্রথম গ্রীক লেখক হোমার (homer) এর রচনায় পাওয়া যায়। যেখানে ‘dike’ বা ‘dikaios’ শব্দগুলি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। ‘dikaios’ বলতে just person কে বোঝানো হয়েছে। প্লেটোই সর্বপ্রথম ‘dike’ এর পরিবর্তে ‘dikaiosune’ শব্দটিকে justice অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্লেটোই সর্বপ্রথম দর্শনের জগতে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় আলোচনার সুত্রপাত করেন। “By the time he (plato) wrote the term ‘dikaiosune’ had already come into usage as a replacement for ‘dike’, indicating that an important extension of the meaning of justice was already in the making.”²

এখন ন্যায়বিচার সম্পর্কিত আলোচনা তখনই যুক্তিপূর্ণ হবে যখন আমরা এটা জানব যে, কেন ন্যায়বিচারের প্রয়োজন? – এই বিষয়টি পাশ্চাত্য ও ভারতীয়- এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

১) পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা –ঃ সাধারণভাবে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনটি কারণের কথা বলা যায়। এগুলি হল -

প্রথমত –ঃ একটি সমাজ ও শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি পারস্পারিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, তাই সমাজ বা গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি কখনই তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে না। তাই সমাজের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। কারণ সমাজে বসবাসকারী কিছু

² Eric A. Havelock, *The Greek Concept of Justice: From its Shadow in Homer to its Substance in Plato* (London: Harvard University Press, 1978), 14.

সংখ্যক ব্যক্তিও যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে তার প্রভাব সমগ্র সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী সকল ব্যক্তির উপর বর্তায়। যেমন- ধরা যাক, কোন সমাজে দুটি নিয়ম তৈরি করা হল -

১। কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে না।

২। একে অন্যের সহযোগিতা করবে।

এবং আরও ধরা যাক যে, X ,Y, ও Z এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যদি X ও Y এই নীতিগুলি অনুসরণ করে, এবং Z যদি না করে তাহলে X ও Y এর পক্ষে যেমন Z দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে, তেমনি Z দুইভাবেই সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তাই সমাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের নিজের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত -ঃ ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগাতে ও সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজের মধ্যে নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

তৃতীয়ত -ঃ সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সুস্থায়ী সামাজিক পরিকাঠামো ও পরিবেশ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেও ন্যায়বিচারের প্রয়োজন।

সুতরাং, উপরোক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে এরূপ মন্তব্য করা যায় যে - সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গুলি স্বেচ্ছায় বা কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ন্যায়পরায়ণ হয় না। অর্থাৎ তারা ন্যায়কে চরম মঙ্গল রূপে গ্রহণ করে না, তাকে অপর কোন মঙ্গল বা সার্থকতা লাভের প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।

সাধারণত এটা পরিলক্ষিত হয় যে, মানুষের পক্ষে অন্যায় সাধন করা সুখকর হলেও অন্যায় ভোগ করা কষ্টকর, তাই মানুষের সমাজে আইন-কানূনের উদ্ভব হয়েছে তার এই ন্যায়-অন্যায়ের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ একদিন যখন মানুষ ‘অন্যায় করা’ এবং ‘অন্যায় ভোগ করা’ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল তখন এটা উপলব্ধি করেছিল যে, কারোর পক্ষেই দ্বিতীয়টির ভোগ ব্যতীত প্রথমটির উপভোগ সম্ভব নয়। ফলে এই মীমাংসায় উপনীত হয় যে, অন্যায় করা এবং অন্যায় সহ্য করা কোনটিতেই লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। এভাবেই একদিন মানুষের সমাজে বিধি-নিষেধ এবং আইন-কানুন এর সূচনা ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়। সুতরাং এই অর্থে ন্যায় বলতে বোঝায় আপোষ ভিত্তিক ভাব অর্থাৎ ন্যায় হলো ‘উত্তম ও অধম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা’। “justice lies between what is most desirable to do wrong and avoid punishment, and what is most undesirable to suffer wrong without redress.”³

এখন ধরা যাক যে, কোন ব্যক্তি ‘ক’ যদি এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে- সে যদি অপর ব্যক্তি ‘খ’ এর ক্ষতি করে তাহলে সে নিজে লাভবান হবে। এই অবস্থায় ‘ক’ ব্যক্তির কি করণীয় ?

যদি বলা হয় যে ‘ক’ ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের ক্ষতি না করা, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে- সে অন্যের ক্ষতি করে তো নিজে লাভবান হতেই পারত, সুতরাং তার এই ন্যায়পরায়ণতার কারণ কি ? এ বিষয়ে আমরা দার্শনিক হিউমের অভিমত আলোচনা করতে পারি। ‘A Treatise of Human Nature’ গ্রন্থে হিউম বলেন যে,

³ D. R. Fisher, “Why Should I Be Just?”, *Proceedings of the Aristotelian Society New Series*, 77. (1976) : 43.

“Reason alone cannot move a man to act but that passion i.e., desires/wants.”⁴। অর্থাৎ মানুষের কোন একটা কাজ করার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল – এটা দেখা যে, সেই কাজের প্রতি তার চাহিদা কতটা আছে, এবং উক্ত কাজটি তার চাহিদার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত আছে কিনা ? এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যে-

ধরা যাক, আমি বাড়ি যেতে চাই। এবং আমার বাড়ি যাওয়ার জন্য শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সকাল ছয়টায় (৬) একটাই মাত্র ট্রেন আছে। এবং আমি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ১০ মিনিট হাঁটা পথে একটা বাড়িভাড়ায় থাকি। এখন আমি যদি সকাল ৫:৫৫ তে বাড়ি থেকে বাহির হই, তাহলে আমাকে ট্রেন ধরার জন্য অবশ্যই দৌড়াতে হবে। এক্ষেত্রে-

বাড়ি যেতে চাওয়া (want statement)

যদি আমি না দৌড়াই, তাহলে ট্রেন ধরতে পারব না।

সুতরাং, আমাকে অবশ্যই দৌড়াতে হবে।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের প্রত্যেকটা কাজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন না কোন কারণ থাকে এবং সে কারণটি হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে থাকে।

⁴ A. D. Lindsay, *Hume's Treatise of Human Nature with Introductions* (vol-2) (London : J.M Dent & sons Ltd, 1911), 165.

ঠিক একইভাবে যদি দেখাতে চাই যে, কেন আমার তথা ব্যক্তিমানুষের ন্যায় বা যথোচিত কাজ করা উচিত? তাহলে আবশ্যিকভাবেই যেন এটা বলে দেওয়া হয় যে, আমার তথা সেই ব্যক্তির কোনো না কোনো লক্ষ্য বা চাহিদা পূরণ করার জন্যই যেন কাজটা করা হয়। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতাকে এক্ষেত্রে একটা উপায় সাধনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নৈতিকতার চূড়ান্ত অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আর যদি পরসুখবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলা হয় যে, অন্যের তথা সমাজের ভালোর উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ সকলের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই ন্যায়পরায়ণতার সহিত কাজ করা হয় এক্ষেত্রেও আপত্তি হয় যে, সমাজের সকলে তো হিতবাদী হয় না, এখন কোন ব্যক্তি যে এরূপ হিতবাদী নয় তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতার সহিত কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় অর্থাৎ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ন্যায্যকাজ করার বা যথোচিত কাজ করার কারণ কি? - এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুই ধরনের মতবাদ পাওয়া যায় -

ক) Heteronomous Theory

খ) Autonomous Theory

ক) Heteronomous Theory :- এই মতবাদে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা বা স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এক্ষেত্রে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ হওয়াটা বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়। “Heteronomous theories base the grounds of juridical

obligation on factors other than the individual's capacity to determine his action.”⁵ - এই মতবাদের কতগুলো প্রকার আছে, যেমন-

অ) Positivism-: Hertz, Kelsen প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে তখনই ন্যায়পরায়ণ বলা হবে যখন সেই ব্যক্তি কোন সার্বভৌম কর্তৃত্ব বা দলগোষ্ঠী কর্তৃক যে সমস্ত বিধি নিষেধ আছে সেগুলো মান্য করবে বা আনুগত্য প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ এই মতবাদে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা বা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে ন্যায়পরায়ণ হওয়াটা বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়।

আ) Natural law theory-: প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য মানুষকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এই নিয়মগুলিকে তাঁরা প্রকৃতিদত্ত নিয়ম বলে গণ্য করেন। এই মতে প্রকৃতিতে সৃষ্টির পূর্ব হতেই এইসব নিয়ম বিরাজ করে আছে, তাই এইসব প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মান্য করার মাধ্যমেই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে। এই মতবাদে আরো বলা হয় যে, এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি মান্য করার বিষয়ে আমাদের কোন নিজস্ব ইচ্ছা বা স্বাধীনতা থাকে না, অর্থাৎ এগুলিকে মান্য করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাধ্য থাকে।

ই) Social contract theory -: হবস, রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণ হলেন সামাজিক-চুক্তি মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদে বলা হয় যে, সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক সংস্থা গঠন করে এবং এই সংস্থার অন্তর্গত প্রত্যেক সদস্যই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে চুক্তিবদ্ধ থাকে।

⁵ Krishna Roy and Chhanda Gupta, *Essays in Social and Political Philosophy* (New Delhi : Allied Publishers, 1989), 122.

তাই এই মতবাদে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার কারণ হল যে, সে পূর্বে এরকম কোন সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকে যে, সে ন্যায়পরায়ণতার সহিত কাজ করবে। সুতরাং, এই মতবাদও ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতাকে চুক্তিভিত্তিক বলে গণ্য করে।

সুতরাং, Heteronomous theoryর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এই মতবাদ সন্তোষজনক নয় কারণ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ হওয়াকে বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এখানে বাধ্যতা বলতে হয় প্রকৃতিদত্ত চাপ সৃষ্টি বা অন্য কোনোভাবে ব্যক্তির উপর জোরপূর্বক কোন কিছু আরোপ করাকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের জন্য তখনই প্রশংসিত বা নিন্দিত করা হয় যখন এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তি যে কাজটি করেছে তা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করেছে অর্থাৎ ব্যক্তির কোন কর্মের ভালো-মন্দের বিচারের ক্ষেত্রে এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যক্তি যে কাজটা করেছে সেটা তার স্বেচ্ছাকৃত নাকি অন্যের দ্বারা জোরপূর্বকভাবে কৃত। এখন যদি সমস্ত কাজকেই অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বলে গণ্য করা হয় অর্থাৎ যদি বাধ্যতামূলক মনে করা হয় তাহলে আর সেই কাজের ভাল-মন্দের বিচার করা যায় না এবং সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তার ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসাও আসে না।

এই মতবাদের বিকল্প হিসেবে আমরা Autonomous theoryর কথা উল্লেখ করতে পারি।

খ) Autonomous Theory -: এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছা, সামর্থ্য ও স্বাধীনতা অনুযায়ী কর্ম করবে। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতাকে ব্যক্তির উপর

জোরপূর্বক আরোপ করা হয় না, তা হয় স্বেচ্ছামূলক। “Autonomous theories, on the contrary, find the basis of obligation in the individual’s capacity to determine his action.”⁶

দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও কান্টের আলোচনায় আমরা এই মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি।

প্লেটোর মতবাদ -: প্লেটো সক্রেটিসের মত ন্যায়পরায়ণতাকে একক ধর্ম হিসেবে স্বীকার করেননি, প্লেটোর মতে ন্যায়পরায়ণতা একটি সমগ্র হলেও তা কয়েকটি মৌলিক ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন –জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, এবং আত্মসংযম। এবং এই তিনটি মৌলিক ধর্ম যথাক্রমে মানবাত্মার তিনটি অংশের সাথে যুক্ত। যেমন- মানবাত্মার –

- ১) বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত উচ্চতম অংশের মৌলিক ধর্ম হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।
- ২) অবিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত উচ্চতর অংশের মৌলিক ধর্ম হল সাহস বা দৃঢ় সংকল্প।
- ৩) নিম্নমানের অংশের মৌলিক ধর্ম হল মিতাচার বা আত্মসংযম।

আত্মার উচ্চতম অংশের কাজ হলো অপর দুটি অংশকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। সুতরাং, প্লেটোর মতে ন্যায়পরায়ণতা হলো একটি সাধারণ ধর্ম - যখন আত্মার প্রত্যেকটা অংশ পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসামঞ্জস্যভাবে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে তখনই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। Justice is a general virtue consisting in this, that every part of the soul performs its proper task in

⁶ Roy and Gupta, *Essays in Social and Political Philosophy*, 122.

due harmony.”⁷। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীব, তাই মানুষ তার স্বভাববশতই দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে ও নগরীর পত্তন করতে চায়। মানুষের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক হল অংশ এবং তার সমগ্রের সম্পর্কের অনুরূপ। তাই ব্যক্তির জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হলে যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থাও ন্যায়সম্মত হয়, তেমনি আবার রাষ্ট্র যদি ন্যায়সম্মত হয়, তাহলে তার প্রতিফলন ব্যক্তির জীবনেও ঘটে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের নাগরিক যদি নীতিভ্রষ্ট হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র যেমন কখনো কল্যাণজনক হতে পারে না, তেমনি আবার কোন রাষ্ট্র যদি নীতিভ্রষ্ট হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দও সুখী ও সৎ জীবন যাপন করতে পারে না। তাই ব্যক্তির নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রের নৈতিকতা বা ন্যায়পরায়ণতা দুটো ভিন্ন বিষয় নয়, তারা উভয়ে এক ও অভিন্ন নৈতিকতা। আর ব্যক্তি তখনই ন্যায়পরায়ণ হবে যখন আত্মার তিনটি অংশের তিনটি মৌলিক ধর্ম যথা- প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও আত্মসংযম যথাযথভাবে পালিত হবে। আর তখনই ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশ সম্ভব হবে ও ব্যক্তির জীবন আনন্দিত হবে এবং ব্যক্তি তথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে।

অ্যারিস্টটলের মত -: অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ হলো বিচারবুদ্ধিশীল জীব। মানুষ যদি তার বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে তবেই সে নৈতিক আদর্শ লাভ করতে পারবে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল যে সূত্রটি অনুসরণ করেন তা হল সুবর্ণ মধ্যম সূত্র (Doctrine of Golden Mean)। তিনি বলেন ন্যায়বিচার মাত্রেরই অবস্থান হল দুটি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা, আর ওই দুটি চরম অবস্থা হলো অতিরিক্ত বেশী এবং অতিরিক্ত কম এর অবস্থা।

⁷ Frederick Copleston, S. J., *A History of Philosophy* (Vol 1) (New York : Doubleday Dell Publishing Group, 1962), 220.

“Aristotle remarks that “ injustice pertains to the extremes”, yet as regards justice there are two extremes: having more than one should, and having less, which Aristotle appropriately describes as “acting unjustly, and being unjustly treated.”⁸

ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল ন্যায়পরায়ণতার আলোচনাও করেছেন। তিনি বলেন ব্যক্তির নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা অভিন্ন নয়। তিনি ন্যায়পরায়ণতা বলতে রাষ্ট্রের নৈতিকতাকেও বুঝিয়েছেন। তিনি সাধারণভাবে ন্যায়পরায়ণতাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। যথা - বন্টনমূলক ন্যায়পরায়ণতা (Distributive Justice) ও সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতা (Corrective Justice)।

বন্টনমূলক ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সম্মান বা পুরস্কার প্রদান করে এবং সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানের দোষী ব্যক্তিবর্গের শাস্তির বিধান দেয়। বন্টনমূলক ন্যায়পরায়ণতা ও সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতা এই দুটি প্রকারকে যুক্ত করে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতায় এটাই বলা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করতে হবে। সকলকে সমভাবে বিচার করাই হলো ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি। যেমন - কেউ যদি অন্যায়ভাবে কিছু সুবিধা ভোগ করে তাহলে সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি অসুবিধার সৃষ্টি করতে হবে। ব্যক্তিজীবনের নৈতিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল ইচ্ছার

⁸ Michael Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction* (New York : Cambridge University press, 2005), 197.

স্বাধীনতাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোন কর্মের ভাল-মন্দের বিচার তখনই হতে পারে যখন কর্মকর্তা নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করে। “Aristotle points out that it is precisely because such action are of the agent’s own accord that we can evaluate them”⁹। তাই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে নৈতিক বিচার, ভালো-মন্দের বিচার হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, যে জীবনে কোন কাজই না-ভাল, না-মন্দ। সুতরাং বলতে হয় যে, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে অ্যারিস্টটল ন্যায়পরায়ণতা তথা নৈতিকতাকে ব্যক্তির স্বাধীন বা স্বেচ্ছাকৃতকর্ম রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

কান্টের মতবাদ :- কান্টের নৈতিক মতবাদ হল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা (Duty for the sake of duty)। তাঁর মতে, নৈতিক কাজের উদ্দেশ্য হলো- অনুভূতিমুক্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা, ঈশ্বরের আদেশ পালন করা নয়। কান্টের মতে, জগতে একমাত্র সদিচ্ছাই নিরপেক্ষ সৎ বস্তু। বাকি যা কিছুকে আমরা সৎ বলে মনে করি যেমন- অর্থ, শাস্ত্র, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি সেগুলো আপেক্ষিকভাবে সৎ হলেও, তা নিরপেক্ষ সৎ নয় অর্থাৎ সেগুলি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে প্রয়োজনীয় হলেও নিরপেক্ষ সৎ নয়, কিন্তু সদিচ্ছা বিনাশর্তে সৎ। “The only thing that is good without qualification or restriction is a good will. That is to say, a good will alone is good in all circumstances and in that sense is an absolute or unconditioned good. We may also describe it as the only thing that is

⁹ Pakaluk, *Aristotle’s Nicomachean Ethics An Introduction*, 124.

good in itself, good independently of its relation to other things.”¹⁰।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে কান্ট বলেন কেবলমাত্র যেসব কাজ কর্তব্যের জন্যই করা হয় সেইসব কাজেরই নৈতিক মূল্য আছে। তিনি আত্মরক্ষার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেমন- আত্মরক্ষা করা আমাদের কর্তব্য এবং যে কোন ব্যক্তিরই এটা করার একটা অব্যবহিত ইচ্ছা আছে, কিন্তু কান্টের মতে যদি আমি আত্মরক্ষা করি এই উদ্দেশ্যে যে আত্মরক্ষা করার ইচ্ছা আমার রয়েছে তাহলে আমার এই কাজের কোন নৈতিক মূল্য থাকবে না, কিন্তু যদি কর্তব্যবোধের জন্য নিজেদের আত্মরক্ষা করি তবেই আমাদের এই কাজের নৈতিক মূল্য থাকবে। এখন কর্তব্যবোধে কাজ করা বলতে কী বোঝায় ? তা বোঝানোর জন্য কান্ট বলেন যে- এটা হল নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কাজ করা অর্থাৎ কর্তব্য হলো নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কাজ করার অনিবার্যতা। মানুষের কাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিচার করতে হলে এটা দেখা প্রয়োজন যে - ওই কাজটি ব্যক্তি নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত করেছে কিনা। কাজের ফলাফল যাই হোক না কেন, তার থেকে নৈতিক মূল্যবোধের বিচার হয় না, নৈতিক মূল্যবোধ উদ্ভূত হয় সেই নীতি থেকে, যে নীতি অনুযায়ী কর্মকর্তা কাজটি করার ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন হলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কিভাবে নিরূপণ করা যাবে? এক্ষেত্রে কান্ট বলেন দৈনন্দিন জীবনে সার্বভৌম আচরণবিধিকে প্রয়োগ করে তা নির্ধারণ করতে হবে। এই আচরণ বিধিটি হল- এমন নিয়ম অনুসারে কাজ করো যে

¹⁰ H. J. Paton, *Kant's Groundwork of The Metaphysic of Morals* (London : Hutchinson & Co Ltd, 1948), 16.

নিয়মকে একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে পারো। "Act as if the maxim of your action were to become by your will a universal law of nature."¹¹। আমাদের ইচ্ছা যাতে নৈতিক দিক থেকে সৎ হয় তার জন্য আমরা অবশ্যই আমাদের প্রশ্ন করব যে, আমাদের ইচ্ছার মনোগত বিধিটি সার্বজনীন হতে পারে কিনা? যদি না হয় তাহলে নীতিটিকে বর্জন করতে হবে। কাজেই কর্তব্যের নিয়মটি হল - যদি আমার নীতিকে সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে না পারি তাহলে আমার সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করা কখনও উচিত হবে না। কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কান্ট ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন মানুষের ইচ্ছা যখন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কর্ম করে তখন মানুষের ইচ্ছা স্ব-শাসিত। অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন করাই হল স্ব-শাসিত ইচ্ছার ধর্ম। কান্ট ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সমস্ত নৈতিক নিয়মের আনুষঙ্গিক কর্তব্যের একমাত্র নিয়ম রূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি হলো নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য। কান্টের মতে প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা নিজস্ব মূল্য আছে তাই মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। মানুষ এমনভাবে আচরণ করবে যাতে সে মনে করে যে, সে এক আদর্শ সমাজের সভ্য - যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি একাধারে রাজা এবং প্রজা। "So act as if you were through your maxims a law-making member of a kingdom of ends."¹²। এইভাবে কান্ট আদর্শ সমাজ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে- প্রতিটি ব্যক্তি শর্তহীন আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি

¹¹ Paton, *Kant's Groundwork of The Metaphysic of Morals*, 30.

¹² *Ibid.*, 34.

রেখে কাজ করবে অর্থাৎ সে বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপরের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আচরণ করবে, ফলে সমাজের নিয়ম মানতে সবারই ইচ্ছা হবে। এবং প্রত্যেকেই সেই নিয়ম রচনা করবে, যে নিয়ম মানতে নিজেরা বাধ্য থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অ্যারিস্টটলের মতো কান্টের মতবাদেও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং বলা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে তখনই ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে যখন সে স্ব-ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করবে।

উপরিউক্ত মতবাদগুলি পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে- ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে স্ব-শাসিত মতবাদ (Autonomous Theory) বেশি গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য বাহ্যিক কোন চাপ বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্য কোন বাধ্যতামূলক কারণের কথা বলা হয় না। বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হবে কারণ সে ন্যায়পরায়ণ হতে চায়। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে নয়, ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে চাই। অর্থাৎ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি তার স্ব-ইচ্ছায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ হওয়ার মাধ্যমে আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারবে, ফলে সমাজ তথা ব্যক্তির জীবনে সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা পাবে।

২) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আলোচনা –ঃ ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থগুলি যেমন বেদ, উপনিষদ শ্রীমদ্ভগবদগীতা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে- এক্ষেত্রেও ব্যক্তির নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈর্ব্যক্তিক সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো মোক্ষলাভ, আর এই মোক্ষলাভ করার জন্য জীবকে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। এই কর্মের প্রেক্ষিতেই আসে ন্যায়বিচারের ধারণা। ভারতীয় দর্শনে বলা হয় যে- ব্যক্তির নৈতিক জীবনের উপর কর্মের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কর্মের মাধ্যমেই একজন অসৎ ব্যক্তিও মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। আর এই প্রসঙ্গেই আসে পুনর্জন্ম ও শ্রেণীবৈষম্যের ধারণা। ভারতীয় সমাজে যে বর্ণ বিভাজনের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চতর শ্রেণী হলো ব্রাহ্মণ এবং সর্বনিম্ন শ্রেণী হলো শূদ্র। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি এই শ্রেণীবৈষম্যের ধারণা দিয়েই থেমে থাকেনি, কর্মের ধারণায় বলা হয় যে প্রত্যেকেই তার নিজ কর্মের মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। তাই যে শূদ্র সে বর্তমানে নিম্নবর্ণের হলেও তার নিজ কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে এবং কর্মের উন্নতি ঘটিয়ে পরবর্তীকালে উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। “শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রয়মৃদুবাগনহৃৎতঃ। ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে।।”¹³। অর্থাৎ শূদ্র যদি পবিত্র ও উচ্চবর্ণের প্রতি অনুগত হয়, এবং মৃদুভাষী, নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণের প্রতি সর্বদা বিনীত থাকে তবে পরজন্মে সে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

¹³ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাঃ), *মনুসংহিতা* (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩), শ্লোক - ৮/২৮, ২৭৮।

আবার ব্রাহ্মণ যদি অসৎ কর্ম করে তবে তাঁকেও তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তাই কোন ব্যক্তিই তার নিজের অবস্থার জন্য অপরকে দোষারোপ করতে পারবে না। ভারতীয় সমাজ দর্শনের এরূপ ধারণা সমাজের সকল ব্যক্তিকে একে অপরের প্রতি সমআচরণ পালনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে সমাজে আর উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ থাকবে না। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে সবার প্রথমে মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে হবে। এভাবে সকলের প্রতি সমআচরণ পালনের মাধ্যমে সমাজ তথা ব্যক্তির জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে।

একইভাবে, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্ম পালনের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন যে - “যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনোঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।”¹⁴। অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ হল সমস্ত জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, তাই তাঁরা যদি নিজের কর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে সমস্ত জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ধংস হয়ে যাবে। তাই সমাজের লোকেদের জ্ঞানী করে উন্নতির পথে আনয়ন করাই হল জ্ঞানী পুরুষের কর্তব্যকর্ম। প্রত্যেক মানুষের উচিত তার নিজ নিজ স্থান ও প্রবণতা অনুসারে জীবের কল্যাণ সাধন করা। এইপ্রকার কর্মই হল কর্তব্যকর্ম বা ন্যায়কর্ম। যেমন- যে সৈনিক দেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত তার উচিত তার ওই কাজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। যদি ক্ষেত্রবিশেষে এমনও হয় যে, সৈনিকের যথানির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করা তার পক্ষে কষ্টদায়ক হচ্ছে তথাপি কর্তব্যকর্ম অবহেলা করা উচিত নয়, কর্তব্যকর্মের ক্ষেত্রে হৃদয়ের দুর্বলতার কোন স্থান নেই, ফলাফলের চিন্তার কোন গুরুত্ব নেই - সমাজে নিজ নিজ স্থান অনুসারে কর্তব্য পালনই ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে

¹⁴ জগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা (কলকাতা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ২০১০), ১০৫।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন “তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।”¹⁵। এইরূপে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা গেলে তবেই সমগ্র জাতি তথা সমস্ত প্রাণীজগতের কল্যাণ সাধন সম্ভব হতে পারে। সুতরাং কর্মযোগের সারকথা হল যে - সমাজের হিতই ব্যক্তির হিত এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্যই ব্যক্তির জন্ম হয়।

তাই বলা যায় যে, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই ন্যায়পরায়ণতাকে ব্যক্তির আত্মিক উৎকর্ষ সাধন তথা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তির কাছে জোরপূর্বক আরোপকৃত বা বাধ্যতামূলক কোন বিষয় নয়। আবার কোন উপায় সাধনের মাধ্যম হিসেবে ন্যায়পরায়ণতা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তি তার সমাজে বসবাসের মাধ্যমে স্ব-ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ সামর্থ্য ও স্বাধীনতা অনুযায়ী যেসব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা যথাযথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমেই ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। এবং এরকম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারাই সমাজ তথা সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

¹⁵ ঘোষ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১০২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের
(প্রাচীনযুগ) আলোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের (প্রাচীনযুগ) আলোচনা

প্লেটোই সর্বপ্রথম তাঁর 'Republic' গ্রন্থে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় দার্শনিক আলোচনার সূচনা করেন। তৎকালীন এথেন্সের আর্থ-সামাজিক সংকটজনক পরিস্থিতি প্লেটোকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি মনে করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে ন্যায়বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় ধারণার পর্যালোচনাপূর্বক নিজমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'Republic' গ্রন্থের সূচনাতে তিনি প্রচলিত মতবাদগুলি উল্লেখ করেছেন এবং সক্রেটিস কর্তৃক যুক্তির দ্বারা সেগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় তাঁর মতবাদ স্থাপন করেছেন।

১) ন্যায় সম্পর্কীয় প্রচলিত মতবাদের আলোচনা ও খণ্ডন -ঃ

'Republic' গ্রন্থে 'Justice' বা 'ন্যায়' সম্পর্কে যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন যেমন- সিফালাস, পলিমার্কাস ও থ্রেসিমেকাসের মতবাদের আলোচনা করা হল।

ন্যায় সম্পর্কিত সিফালাসের মত -ঃ সিফালাসের মতে - ঋণপরিশোধ করা এবং কথায় ও কাজে সততা বজায় রাখাই হল ন্যায়। "Socrates provokes Cephalus to say something which he spins into the view that justice simply boils

down to always telling the truth and repaying one's debts.”¹। সিফালাস দাবী করেন যে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে তিনি কোনদিন অন্যায় আচরণ করেননি। যার যা প্রাপ্য সকলকে তা বুঝে দিয়েছেন, এবং তাঁর নিজের যতটা প্রাপ্য তাই নিয়েছেন। তিনি বলেন মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব তাই আমরা সকলেই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে পারস্পারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকি। প্রত্যেকের কাছেই আমরা কোন না কোন ভাবে ঋণী। তাই ঋণ পরিশোধের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ হতে পারব। এই মতবাদের বিরুদ্ধে সক্রোটিস বলবেন ন্যায়সম্পর্কিত সিফালাসের ধারণা গ্রহণ করলে ন্যায়ের ধারণা আপেক্ষিকতাবাদে পরিণত হয়। কারণ সাধারণভাবে তা গ্রহণযোগ্য হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তা প্রযোজ্য হয় না। যেমন- ধরা যাক, কোন ব্যক্তি ‘ক’ অপর কোন ব্যক্তি ‘খ’ এর কাছে কোন ধারালো অস্ত্র গচ্ছিত রেখেছে এবং আরও ধরা যাক যে, কিছুদিন পর ঐ ‘ক’ ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে গেছে। এখন ঐ ‘ক’ ব্যক্তি যদি তার গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে নিতে চায় সেক্ষেত্রে ‘খ’ ব্যক্তির কি করা উচিত? সিফালাসের মতবাদ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে যদি তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হতে পারে। এক্ষেত্রে তাই সক্রোটিস বলবেন যে এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে ন্যায় সম্পর্কিত সিফালাসের মতবাদ গ্রহণ করলে আমরা কোন্ কাজকে ন্যায় বলে বিবেচনা করব সে বিষয়ে দ্বন্দের সম্মুখীন হই। তাই

¹ R.C Cross and A.D Woolzfy, *Plato's Republic: A Philosophical Commentary* (London : Macmillan, 1966), 12.

সক্রেটিসের মতে, বলবেন যে সিফালাসের 'ন্যায়ে'র ধারণা সার্বিক না হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

ন্যায় সম্পর্কিত পলিমার্কাসের মত -ঃ সিফালাসের মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে পলিমার্কাস বলেন, যে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই হল ন্যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলের প্রাপ্য এক হয় না। যেমন- আমার কাছে আমার বন্ধুর প্রাপ্য একপ্রকার ও শত্রুর প্রাপ্য আর এক প্রকার। তাহলে পলিমার্কাসের মত অনুযায়ী বলতে হয় - বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতিসাধনই হল ন্যায়। “Polemarchus, the son of Cephalus, jumps into the discussion, espousing the familiar, traditional view that justice is all about giving people what is their due. But the problem with this bromide is that of determining who deserves what. Polemarchus may reflect the cultural influence of the Sophists, in specifying that it depends on whether people are our friends, deserving good from us, or foes, deserving harm.”²

এই মতবাদের বিরুদ্ধে যে সক্রেটিস আপত্তি করবেন যে -

প্রথমত - যদি শত্রুর ক্ষতি সাধন করা ও বন্ধুর উপকার সাধন করা ন্যায় হয় তাহলে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের চারপাশে দুই ধরনের মানুষ আছে যাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আমার বন্ধু, আবার কোন কোন ব্যক্তি আমার শত্রু। ধরা যাক, 'ক' নামক ব্যক্তি আমার বন্ধু এবং 'খ' নামক ব্যক্তি আমার শত্রু। কিন্তু 'ক' 'খ' এর শত্রু না হয়ে বন্ধু হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি যদি 'খ' এর ক্ষতিসাধন করি তাহলে তা

² Cross and Woolzfy, *Plato's Republic*, 17.

প্রকারান্তরে 'ক' ব্যক্তির ক্ষতিসাধন হবে, ফলে শত্রুর ক্ষতিসাধন করতে গিয়ে আমরা বন্ধুর ক্ষতিসাধন করে থাকি।

দ্বিতীয়ত - বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতিসাধন এই নীতি গ্রহণ করলে এটা দাবী করা হয় যে আমাদের বিচার সর্বদা অভ্রান্ত অর্থাৎ যাকে আমার বন্ধু বলে মনে হয় সে প্রকৃত বন্ধু এবং যাকে আমার শত্রু বলে মনে হয় সে আমার প্রকৃত শত্রু। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বিচার সবসময় অভ্রান্ত হয় না, যদি অভ্রান্ত না হয় তাহলে আমার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি আমার বন্ধুভাবে উপস্থিত হয় আমি তার ক্ষতিসাধন এর পরিবর্তে উপকারই করব সেক্ষেত্রে পলিমার্কাসের নীতির লঙ্ঘন হবে। সহজ কথায় উপকার সাধন ও ক্ষতিসাধনের নীতি নিঃশর্ত নয়, এই নীতি যদি কার্যকর হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে কে শত্রু, কে মিত্র তা প্রকৃতপক্ষে যাচাই করার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের আছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা সবক্ষেত্রে সঠিক হয় না। সুতরাং সক্রেটিসের অভিমত হল ক্ষতিসাধনের নীতি যদি ন্যায় হিসেবে গণ্য হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তা অন্যায়ের আবির্ভাব ঘটাবে তাই পলিমার্কাসের নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। এইভাবে সিফালাস ও পলিমার্কাস এর বক্তব্য খণ্ডন করে প্লেটো ন্যায় সম্পর্কে থ্রেসিমেকাসের মত উল্লেখ করেছেন।

ন্যায় সম্পর্কিত থ্রেসিমাকাসের মতবাদ খণ্ডন -ঃ থ্রেসিমেকাস একজন সোফিস্ট মতাবলম্বী। তাঁর মতে ন্যায় হল বলবানের স্বার্থ “justice is relative to whatever

is advantageous to the stronger people.”³। সক্রেটিস জানতে ইচ্ছুক- বলবান বলতে কি বোঝায়?

এক্ষেত্রে থ্রেসিমেকাস বলেন যে, শারীরিক দিক থেকে বলবানকে তিনি প্রকৃত বলবান বলে মনে করেন না। তাঁর মতে যিনি রাষ্ট্রের শাসক তিনিই হলেন প্রকৃত বলবান। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার থেকে বড় ক্ষমতা আর কিছু হয় না, এবং যেহেতু শাসক ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তাই শাসকই হলেন প্রকৃত বলবান। প্রশ্ন হবে- তাহলে শাসকের স্বার্থ কি? থ্রেসিমেকাস বলবেন শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থই হল তার স্বার্থ। অর্থাৎ শাসক রাষ্ট্র শাসন করলেও তাঁর কাছে রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রধান। তিনি বলেন মানুষ মূলত স্বার্থপর জীব, প্রত্যেকেই তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। তাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে স্বার্থ পূরণের ক্ষেত্রে শাসকের যে সুবিধা থাকে শাসিতের সেই সুবিধা থাকে না। দুর্বল হওয়ার কারণে শাসিতকে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় অর্থাৎ অন্যায়কে মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ থ্রেসিমেকাসের মতে যারা শাসিত তাদের পক্ষে অন্যায় আচরণ করা সুবিধাজনক না হলেও শাসকের পক্ষে অন্যায় আচরণ সম্ভব। তিনি বলেন সমাজ হল আইনের দ্বারা সংগঠিত জনসমষ্টি। সমাজে আইন বলবৎ থাকলে সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের জীবন সুরক্ষা থাকে। প্রত্যেকে নাগরিক সমাজে বাস করার কারণে কিছু সুবিধা ভোগ করে। এখন এই আইনের শাসন দ্বারা সুরক্ষিত সমাজে কোন ব্যক্তি যদি আইনকে পাশ কাটিয়ে

³ Cross and Woolzfy, *Plato's Republic*, 19.

যেতে পারে, তাহলে সে বাড়তি সুবিধা পাবে। আর শাসক সেই বাড়তি সুবিধাটি পায়।

এটাই হল শাসকের স্বার্থ।

এক্ষেত্রে থ্রেসিমেকাসের বিরুদ্ধে সক্রোটিস অভিযোগ করবেন যে – যেহেতু মানুষ মাত্রই ভুল করে তাই শাসক যদি নিজের স্বার্থ সম্পর্কে ভুল করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে ? সক্রোটিসের মতে শাসনকার্য একপ্রকার কলা-কৌশল বা শিল্প যার জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন – একজন প্রকৃত চিকিৎসক হলেন তিনি, যিনি রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারেন। চিকিৎসকের মূল স্বার্থ হল রোগীর রোগ সারিয়ে তোলা এই কারণেই সাধারণ মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায়। এবং চিকিৎসকের সেবার দ্বারা যেহেতু রোগীর প্রয়োজন সাধিত হয়, চিকিৎসকের নিজের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না, সেহেতু চিকিৎসককে তার পরিষেবার জন্য মূল্য দিতে হয়। এক্ষেত্রে সক্রোটিসের বক্তব্য হল শাসনকার্য যেহেতু একপ্রকার শিল্প তাই এর উদ্দেশ্য হল শাসিতের স্বার্থ রক্ষা করা ও তাদের মঙ্গলসাধন করা। যেহেতু শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষিত হয় না তাই শাসককে তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। সক্রোটিসের মতে, স্বার্থপরতার নীতি হল শক্তিক্ষয়ের নীতি, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানের নীতি, সুখের পরিবর্তে অসুখের নীতি। জনগণের স্বার্থ ও জনগণের মঙ্গলের কথা ভুলে গিয়ে শাসক যদি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে তাহলে শাসন কার্য দুর্বল হয়ে পড়বে। সক্রোটিসের মতে, আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন একসূত্রে বাঁধা।

তাই থ্রেসিমেকাসের ন্যায়ের ধারণা গ্রহন করলে সমস্ত কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্যতা হারাবে। সাধারণ জনগণ তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে এবং সমাজে এক অনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়ের জন্ম দেবে। সুতরাং সক্রেটিসের মতে থ্রেসিমেকাসের ন্যায়ের ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরিউক্ত প্রকারে প্লেটো সক্রেটিস প্রদত্ত যুক্তির মাধ্যমে ন্যায় সম্পর্কীয় সোফিস্ট সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে ন্যায়ের ধারণা কখনো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে, ভিন্ন ভিন্ন সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হলে চলবে না। বরং ন্যায়বিচারের ধারণা হতে হবে সার্বিক আচরণের নীতি অনুযায়ী, যাতে তা সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য হতে পারে। যার দ্বার শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষিত হবে তা নয়, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার ক্ষেত্রেও নজর দেওয়া হবে। অর্থাৎ ন্যায়বিচার হল তাই যার মাধ্যমে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হবে। এভাবে প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২) প্লেটোর ন্যায়বিচারের ধারণা -ঃ

প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার হল আদর্শ সদৃশ যা চরিত্রগত, একদিকে রাষ্ট্রের চরিত্র এবং অপরদিকে মানুষের চরিত্র - এই উভয় চরিত্রের মাধ্যমে এই সদৃশগুণটির বিকাশ ঘটতে পারে। প্লেটো বলেন মানুষ হল বিচারবুদ্ধিশীল সমাজবদ্ধ প্রাণী। সমাজ বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত সংগঠন হল রাষ্ট্র। ব্যক্তি রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়,

আবার রাষ্ট্রই মানুষের জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই মানুষের সাথে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে মানুষের চরিত্রের সদগুণগুলি রাষ্ট্রের উন্নত রূপ হিসেবে প্রকাশ পায়। এবং ব্যক্তি-মানুষের আকারের থেকে রাষ্ট্রের আকার বৃহৎ হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে ন্যায়বিচার নামক সদগুণটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। “justice is seen as an essential virtue of both a good political state and a good personal character. The strategy hinges on the idea that the state is like the individual writ large—each comprising three main parts such that it is crucial how they are interrelated—and that analyzing justice on the large scale will facilitate our doing so on the smaller one.”⁴ । তাই প্লেটো প্রথমে সমাজ বা রাষ্ট্রে কিভাবে ন্যায়বিচার প্রতিস্থাপিত হবে তা আলোচনা করার পর ব্যক্তির চরিত্রে সদগুণের প্রকাশ কিভাবে ঘটবে তা বর্ণনা করেছেন।

প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপের মধ্যে ন্যায়বিচারের ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? বাস্তবিকপক্ষে আদর্শ রাষ্ট্র কোথাও নেই আদর্শ থাকে মানুষের কল্পনায়, বাস্তব হল তারই কম বা বেশী অসম্পূর্ণ রূপ। প্লেটো তাঁর ‘Republic’ গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের প্রথম শর্ত হল উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিকভাবে প্রচলন করা। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে দুটি ক্রমে বিভক্ত করেন – প্রাথমিক শিক্ষা ও

⁴ Shri Raghuveer Sing, “Platonic Justice : A Critical analysis”, *The Indian Journal of Political Science* 10, 3. (1949): 63.

উচ্চশিক্ষা। এই উভয় প্রকার শিক্ষাকেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রেখেছেন। প্লেটোর মতে প্রাথমিক শিক্ষাকে হতে হবে সার্বজনীন, আবশ্যিক ও তার পাঠ্যসূচি হবে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার অধিকার থেকে নারী বা পুরুষ কোন ব্যক্তিকেই বঞ্চিত করা হবে না। প্লেটোর মতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে বাছাইপর্ব হবে তা আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বাছাইপর্বের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগরিকের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে, যা আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় শর্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের শ্রেণী বিন্যাস প্রথম থেকেই স্থির নয়। শিক্ষার প্রথমে প্রত্যেককেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে গণ্য করা হবে এবং তাদের যে দ্বিতীয় প্রজন্ম হবে তাদেরকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা হবে সেটাও স্থির নয়। প্রকৃতি ও পরিচর্যা উভয়ের মিলিত সংযোজনের ফলেই নির্ণিত হবে বিশেষ শ্রেণী। প্লেটোর আদর্শ গণরাজ্যে জনগণের শ্রেণীবিন্যাস এই কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, নাগরিকদের মধ্যে কে কোন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে তা এই শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। যেমন- প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ হবেন রাজ্যের অভিভাবক শ্রেণীভুক্ত আর তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির হাবে উৎপাদক শ্রেণী। অভিভাবক শ্রেণী আবার দুইভাগে বিভক্ত – যারা সূবর্ণশ্রেণী তাঁরা হবেন যথাযথ অভিভাবক বা উচ্চতর অভিভাবক, আর যারা রজতঃ শ্রেণীভুক্ত তাঁরা হবেন নিম্নশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর অনুগত। প্রথম শ্রেণীর অভিভাবক সম্প্রদায় হবেন রাষ্ট্রের আইন-প্রণেতা ও নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গলের কর্তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবকেরা হবেন পুলিশ, প্রশাসন, ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত। আর তৃতীয়

শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়গণ হবে উৎপাদক শ্রেণী। তারা কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বিনোদন প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এবিষয়ে প্লেটো বলেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র তিনশ্রেণীর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ পরিলক্ষিত হবে না। কারণ প্রত্যেকেই এরূপ শিক্ষা দেওয়া হবে যে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও রাষ্ট্রের পক্ষে সকলেই সমান মর্যাদাপূর্ণ। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের নির্দিষ্ট অবস্থান ও যোগ্যতা আছে তাই প্রত্যেকের সফলতার মাধ্যমেই রাষ্ট্র সফলকাম ও শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারবে যার দ্বারা সকল নাগরিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হবে।

অতঃপর প্লেটো ন্যায়বিচারের প্রকাশ কিভাবে হবে তা আলোচনা করেন – তিনি প্রজ্ঞা, সাহস ও মিতাচার ও ন্যায়বিচার এই চারভাগে বিভক্ত সদৃশগুণকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর যারা অভিভাবক তাদের প্রজ্ঞাই হল রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা। তাঁরা রাষ্ট্রের শুভ-অশুভ বোঝেন, রাষ্ট্রকে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে সেসব বিষয় তাঁরা নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রের যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবক তাদের শৌর্যই হল রাষ্ট্রের শৌর্য। প্লেটোর মতে শৌর্য হল সেই জ্ঞান যার দ্বারা ব্যক্তি ভাল-মন্দের ধারণা লাভ করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবকগণ প্রথম শ্রেণীর অভিভাবকদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। রাষ্ট্রের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়গণ হলেন উৎপাদক শ্রেণী। তাদের মিতাচার হল রাষ্ট্রের মিতাচার। উৎপাদক শ্রেণী ক্লাস্তি-বিহীন, নিরলস ও পূর্ণ-আনুগত্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়। এরা প্রথমত দ্বিতীয় শ্রেণীর

অভিভাবকদের প্রতি অনুগত এবং যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবকবৃন্দগণ প্রথম শ্রেণীর অভিভাবকদের প্রতি অনুগত তাই এই উৎপাদক শ্রেণী পক্ষান্তরে প্রথম শ্রেণীর অভিভাবকদের প্রতিও অনুগত। “.....there are three classes engaged in a kind of division of labour. There is a guardian class which rules, a class of ‘auxiliaries’ that provide the force behind the ruling, and the class of merchants that produce to satisfy the needs and desire of the city.”⁵

অতঃপর প্লেটো বলেন যে – যখন এই তিনটি শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে তখনই রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের তিনটি মূল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আনুগত্যের ধারা ও ঐক্যবোধ বজায় রাখার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। এবং যে রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন বিরোধ থাকবে না ও প্রত্যেকটি নাগরিক তাদের নিজের নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে। প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার যে রাষ্ট্রের সদৃশ সেই রাষ্ট্র আয়তনে, ও সম্পদে ছোট হলেও তা সুখী রাষ্ট্র এবং অজেয়। সেক্ষেত্রে বহিরাগত কোন শক্তি সেই রাষ্ট্রকে পদানত করতে পারবে না। সেই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমস্ত শক্তি দিয়ে রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে এবং পরাধীনতার থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করবে।

⁵ LeBar Mark and Slote Michael, “Justice as a Virtue”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue>. (accessed november, 2018).

প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের মতো মানুষের স্বভাবের মধ্যেও তিনটি বৈশিষ্ট আছে বলে মনে করেন, সেগুলি হল- প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও মিতাচার। এবং আদর্শ রাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যেও যখন এই তিনটি গুণের সামঞ্জস্য বজায় থাকবে তখন সে ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে। “...similarly, the psyche of the individual has three parts; a reasoning part to rule, a ‘spirited’ part to support the rule of reason, and an appetitive part. Plato finds justice in the city to consist in each part ‘having and doing its own’, and since the smaller is just like the larger, justice in the individual consist in each part of the psyche doing its own work.”⁶ এবং একজন ব্যক্তির পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করা তখনই সম্ভব হবে যখন সে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে।

এখন প্রশ্ন হল – যদি রাষ্ট্রের আইন ভুল করে কোন ব্যক্তিকে কারাবন্দী করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি ঐ ব্যক্তির পক্ষে আইন ভঙ্গ করে জেল থেকে পালিয়ে আসা কি ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে?

এই প্রসঙ্গে প্লেটোর মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি ‘Crito’ তে তিনি সদৃশ একটি উপমার কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে সক্রটিস ও তার বন্ধু ক্রিটো-এঁদের কথোপকথানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে , সক্রটিসকে অন্যায়ভাবে জেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বন্ধু ক্রিটো যখন তাঁকে জেল থেকে পলায়ন করার কথা বলে সেক্ষেত্রে সক্রটিস তাঁর যুক্তি প্রত্যাখান করেন। কারণ তিনি মনে করেন

⁶ LeBar Mark and Slote Michael, “Justice as a Virtue”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue>.(accessed november, 2018).

যদিও তাঁর ক্ষেত্রে শাস্তিটা অন্যায়ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে তথাপি তাঁর আইন অমান্য করে জেল থেকে পলায়ন করা অনুচিত হবে। “According to him “It is never right to do an Injustice even if you suffered an injury first.”⁷ তাঁর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আইনের মাধ্যমেই বজায় থাকে, তাই আইন অমান্য করা অনুচিত কাজ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিজের বা পরিবারের মঙ্গলের তুলনায় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায় যে, প্লেটো সমাজে ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন বা নিয়ম মান্য করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন। যদিও তিনি শ্রেণীবিভাজনের উল্লেখ করেছেন তথাপি তাঁর আদর্শ সমাজে সকল শ্রেণীকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এইভাবে প্লেটো এক আদর্শ সমাজ বাস্তবায়িত করার কথা বলেন।

⁷ David Sachs, “A Fallacy in Plato’s Republic”, *The Philosophical Review* 72, 2. (1963): 141.

৩) অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিচারের ধারণা -৪

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল ছিলেন সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ। অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁর পূর্বসূরি দার্শনিক প্লেটোর মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষত নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সেই প্রভাব ছিল যথেষ্ট সুস্পষ্ট। অ্যারিস্টটলের নীতিবিদ্যার উপর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল ‘Nicomachean Ethics’। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোচনার সূচনা হয় এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে যে - মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো কি লাভ করতে পারে ?

এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল আনন্দের উল্লেখ করেছেন। মানুষের পরম উদ্দেশ্য হল আনন্দলাভ এবং এই পরম উদ্দেশ্যের অন্বেষণ মানুষের জন্য কেমন জীবন হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণে তিনি বলেন যে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত জীবন ই হল সর্বোত্তম জীবন, এবং তা সম্ভব হবে একমাত্র সদগুণের অনুশীলনের মাধ্যমে। সদগুণের বর্ণনায় অ্যারিস্টটল বলেন যে- সদগুণ হল এমন একটি চারিত্রিক অবস্থা যা সম্ভাব্য সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে অবস্থান করে, আর কোনো কাজ বা বিষয়কে তখনই সদগুণসম্পন্ন বলা হবে যখন সেটি সঠিক সময়ে, সঠিক উদ্দেশ্যে এবং সঠিক বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে সম্পাদিত হবে। “Each virtue itself, as a state, is intermediate between two other states, a vice of excess and a vice of deficiency.” And ‘Every virtue as regards that of which it is a virtue,

Aristotle says there, bring that thing into a good condition, and venders its work good.”⁸

এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল বলেন যে কোন কাজ সদৃশসম্পন্ন হতে গেলে কাজটিকে অবশ্যই কর্মকর্তার স্বইচ্ছায় সম্পাদিত হতে হবে, ইচ্ছা নিরপেক্ষ ত্রিয়া সম্পাদন দ্বারা কোন মানুষকে সৎ বা অসৎ বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। অ্যারিস্টটলের মতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের কর্মপন্থা নির্ধারণের স্বাধীনতা আছে এই কথা না মানলে নৈতিকতা ও নৈতিক বিচার এক ভ্রান্তিতে পরিণত হয়, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে যান্ত্রিক- যে জীবনে কোন কাজই না ভালো, না মন্দ। যেখানে ব্যক্তির নিজের কাজটি করতে পারার স্বাধীনতা আছে কেবল সেই কাজেরই নৈতিক বিচার হতে পারে। অ্যারিস্টটল ন্যায়বিচারকে সদৃশের অন্যতম একটি অংশবিশেষ হিসেবে গণ্য করে একটি বিশেষ অর্থে স্বীকার করেছেন।

সাধারণভাবে ন্যায়বিচার বলতে আমরা বুঝি যে এটি এমন একটা চারিত্রিক অবস্থা যার দ্বারা ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করে থাকে এবং সেটাকেই বাসনা করে যা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচ্য হয়। অনুরূপভাবে অন্যায় বলতে বোঝায় সেই অবস্থা যা মানুষকে অন্যায়ভাবে কাজ করিয়ে থাকে এবং বাসনা করে সেটাকে যা অন্যায় প্রকৃতির হয়।

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে Justice বা ন্যায়বিচার শব্দটি তিনটি অর্থকে ইঙ্গিত করে -

⁸ Michael Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction* (New York: Cambridge University, 2005), 10.

ক) এমন একটি পরিস্থিতি বা ঘটনা যা ন্যায়সঙ্গত হয় ।

খ) কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যা ন্যায়সঙ্গত হয় এবং যে অভিপ্রায়ে কাজটি সম্পাদিত হয় ।

গ) ন্যায়বিচার হলো একটি চারিত্রিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সৎ উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদন করায় এবং যার ফলে ওই ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বলা হয় ।

অ্যারিস্টটল ন্যায়বিচারের ধারণাকে উপরিউক্ত তিনটি অর্থেই গ্রহণ করেছেন ।

সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতে ন্যায়বিচার হলো সেই চারিত্রিক অবস্থা যার দ্বারা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়সঙ্গত কাজ করে থাকে এবং সেই আচরণ করে যা তার নিজের জন্য ও অপরের জন্য ভালো হয় এবং সেই ব্যক্তি তার নিজের অতিরিক্ত কোনো লাভ অর্জনের জন্য ভালো কাজ করে না, বরং সে ভালো কাজ করে এজন্য যে- দেশের সকল নাগরিক যাতে সমানুপাতিকভাবে সম্পদের অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারে, যার ফলে সকলের মধ্যে সমানুপাতিকভাবে ন্যায্যতা ও সাম্য বজায় থাকবে ।

“we observe, then, that everyone intends, in referring to ‘justice’, to mean that condition of character which makes someone the sort of person who does just action, and who likes to see justice done. In the same way by ‘injustice’ they mean that which makes someone the sort of person who acts unjustly and likes to see injustice done.”⁹

⁹ Pakaluk, *Aristotle’s Nicomachean Ethics An Introduction*, 180.

অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মতবাদ বুঝতে গেলে আমাদের ‘ন্যায়’, ও ‘অন্যায়’ এই শব্দগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হওয়া দরকার। ‘ন্যায়’, ‘অন্যায়’ এই শব্দগুলো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। এইসব শব্দের অর্থের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না। যেমন কোন একজন ব্যক্তিকে অন্যায়কারী বলা যাবে- যদি ব্যক্তিটি অপরের সম্পদ হরণ করে, যদি অপরকে আঘাত করে, যদি সমতাবিরোধী হয়, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন অমান্যকারী ব্যক্তিটিকে যেমন অন্যায়কারী বলা হয়, তেমনি যে ব্যক্তি এইসব কাজ থেকে বিরত থাকে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলা হয়। আমরা অনেক সময় কোন অবস্থাকে বুঝে থাকি তার বিপরীত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন দুঃখের অবস্থাটি যদি হয় ক্রন্দন করা বিপরীতভাবে সুখের অবস্থাটি হবে আনন্দে থাকা। একইভাবে অন্যায় কর্ম সম্পর্কে অবহিত হলে এর বিপরীত অবস্থাটি যে ন্যায়কর্ম তা আমরা বুঝতে পারবো। যদি ‘অন্যায়’কে চিহ্নিত করা হয় আইন অমান্যকারী হিসেবে তবে যা আইনানুগ কাজ তাকেই ‘ন্যায়’ বলে গণ্য করা হবে।

❖ প্রশ্ন হল সকল আইনানুগ কাজমাত্রই কি ন্যায়কাজ বলে গণ্য হবে ?

কোন একটি কাজ ন্যায়সঙ্গত হওয়ার জন্য আইনত হওয়ার পাশাপাশি সেই কাজটি কতটা নীতিসম্মত তা বিচার করার প্রয়োজন আছে। যে সকল কাজ আইন প্রণয়ন-কলা দ্বারা সঠিক বলে ধার্য করা হয় সেগুলোকে আইনসম্মত কাজ বলা হয়। নীতিসম্মত ও আইনসম্মত কথা দুটোর অর্থ এক নয়, অর্থাৎ যা কিছু নীতিসম্মত তা আইনসম্মত হলেও, আইনসম্মত কাজমাত্রই নীতিসম্মত নাও হতে পারে। নৈতিকতার সাথে আইনের পার্থক্য জানার জন্য প্রথমেই আমাদের আইন বলতে কী বোঝায় তা

জানতে হবে। “বর্তমানে চারপ্রকার আইন প্রচলিত আছে- ক) স্টাটিউট খ) রেগুলেশন
গ) সাধারণ আইন (কমন ল’) ঘ) প্রশাসনিক আইন।”¹⁰

ক) স্টাটিউট -ঃ কোন সরকার দেশ পরিচালনা করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসব আইনের উপর নির্ভর করে থাকে তাকে স্টাটিউট আইন বলা হয়।

খ) রেগুলেশন -ঃ আইনের কোন ধারা অস্পষ্ট থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা বা নতুন কোন ধারা সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে তা সুপারিশ করার জন্য আইনসভা কোন কোন সময় আইন কমিশন বা কমিটি গঠন করে থাকে। যেমন- চিকিৎসক ও নার্সের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ এর জন্য কমিশন গঠন, কৃপামৃত্যুর নৈতিকতা নিরূপণের জন্য কমিটি গঠন করা, কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য কমিশন গঠন করা ইত্যাদি।

গ) সাধারণ আইন (কমন ল’) -ঃ কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করার ফলে তা সর্বজনস্বীকৃত আইনে পরিণত হয়। সাধারণ আইন বলতে এইধরনের আইনকেই বোঝান হয়ে থাকে।

ঘ) প্রশাসনিক আইন -ঃ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আদালতের কোন এজিয়ার না থাকলেও যদি কোন আইনের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে তাহলে আদালত সেই আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল বলে ঘোষণা করার অধিকার রাখে।

¹⁰ এ. এস. এম. আব্দুল খালেক, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা* (ঢাকা : অনন্যা, ২০০৫), ৬৪।

এখন নৈতিক কাজ বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা দরকার। আমরা যা কিছু কাজ করি তার মধ্যে কিছু কাজ যেমন বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়, তেমন কিছু কাজ আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবেও করে থাকি। যেমন- শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা, তীব্র আলোকে চোখের পাতা বন্ধ করা, গরম পাত্রে হাত দেওয়া মাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি - এসব কাজ হলো বাধ্যতামূলক। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা না করে পারি না। যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলক, যাদের না করে আমরা পারি না, এইসব কাজের ক্ষেত্রে যেমন নৈতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে ভাল বলা যায় না, তেমনি মন্দও বলা যায় না। আমরা এমন বলি না যে, শ্বাস নেওয়া ভালো / মন্দ, বা চোখ বন্ধ করা উচিত /অনুচিত। তাই বাধ্যতামূলক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভাল-মন্দ, উচিত- অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক বিচার হয়। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম যেমন আমরা করতে পারি, তেমন আমরা কাজটি না করেও থাকতে পারি। যেমন- আমরা ইচ্ছা করলে গান-বাজনা করতে পারি, আবার গান-বাজনা নাও করতে পারি। তাই কর্ম করার বা না করার স্বাধীনতা থাকার জন্য স্বেচ্ছাকৃত কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয়, এবং যে কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয় কেবল সেইসব কাজের ক্ষেত্রেই 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত', ইত্যাদি নৈতিক গুণাগুণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রকার নৈতিক বিশেষণযুক্ত কর্মকেই নৈতিক কর্ম বলা হয়। নৈতিক কর্ম যেমন 'ভাল', হয় তেমনি 'মন্দ'ও হয়। নৈতিক কর্মের মধ্যে 'ভাল', 'উচিত', ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত কর্মকে বলা হয় নীতিসম্মত কর্ম। আর 'মন্দ', 'অনুচিত' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত কর্মকে বলা হয় নীতি-গর্হিত বা অনৈতিক কর্ম।

আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে- কোন কাজ আইনসম্মত হওয়া আর নীতিসম্মত হওয়া দুটি ভিন্ন বিষয়। আইনকে নৈতিক আচরণ নির্ধারণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ কোন কোন সময় যা আইনসম্মত তা অনিবার্যরূপে নৈতিক নাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে - যেমন ধরা যাক, চার মাসের একটি শিশু হঠাৎ ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হল। পারিবারিক চিকিৎসক দ্বিতীয় দিনে চিকিৎসা শুরু করলেন এবং তৃতীয় দিনে অফিস চলাকালীন সময়ে চেক করে গেলেন। চতুর্থ দিনে শিশুর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং জ্বর বেড়ে যায়, পারিবারিক চিকিৎসক অফিসে না থাকার কারণে শিশুটিকে নিকটস্থ একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন কোন রোগীকে চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া চিকিৎসা করার বিধান নেই। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটির চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার পরিবার শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে এলে শিশুটি মারা যায়। এক্ষেত্রে নৈতিক দিক থেকে বলা যায় যে - হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল শিশুটিকে চিকিৎসা করা এবং তাকে জীবনরক্ষাকারী সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত না করা, কিন্তু তারা আইনের উপর ভিত্তি করে শিশুটির চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাজ আইনসিদ্ধ হলেও তা অনৈতিক বলেই গণ্য হয়, এবং তা একধরনের অন্যায়ও বলা যায়। সুতরাং আইনসম্মত হলেই যে কোন কাজ ন্যায্যসঙ্গত হবে - এরূপ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে আইন অমান্যকারী ব্যক্তিকে অপরাধী বলা

হলেও সেই ব্যক্তি অনৈতিক নাও হতে পারে। সুতরাং ‘ন্যায়’, ‘অন্যায়’ কর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনসম্মত হওয়া যেমন দরকার, তেমনি সেই কাজের নৈতিক দিকটিও বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

আবার এমন কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলোর প্রকাশ অন্যায়ভাবে হলেও সেগুলিকে বৃহত্তর অর্থে অন্যায়ের থেকে পৃথক বলে মনে করা হয়। যেমন কাপুরুষতাবশতঃ যুদ্ধচলাকালীন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি তার সহযোদ্ধাকে ফেলে চলে আসে বা অতিরিক্ত রাগের কারণে যদি অপরকে আঘাত করে ফেলে যদিও এক্ষেত্রে ব্যক্তির অপরকে আঘাত করার মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না, অথবা যদি অভাবের তাড়নায় অপরকে সম্পদ হরণ করে, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচরণগুলোর মধ্যে অন্যায় প্রকাশ পেলেও তা বৃহত্তর অর্থে অন্যায়ের থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়। সুতরাং বলা যায় যে, বৃহত্তর অন্যায়ের থেকে ভিন্ন ধরনের যেমন এক বিশেষ অন্যায় আছে, অনুরূপভাবে বৃহত্তর ন্যায়ের থেকে ভিন্ন আর একধরনের বিশেষ ন্যায়ও আছে। তবে ন্যায়, অন্যায় উভয় কাজের তাৎপর্য নির্ধারিত হয় প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে লাভবান হওয়ার কারণে যদিও উক্ত কাজের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তার উদ্দেশ্য কি তা জানা প্রয়োজন। উপরিউক্ত মতবাদের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ন্যায়কর্ম হল তাই – যেখানে সদৃশের পূর্ণরূপটির চর্চা হয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর অন্যায়কর্ম হল তাই – যেখানে মন্দগুণটির চর্চা হয় প্রতিবেশীর প্রতি। বহু মানুষ আছে যারা সদৃশের চর্চা করে তাদের নিজস্ব কাজ-কর্মে, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কে নয়। সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলো সেই ব্যক্তি যে তার সদৃশের চর্চা করে শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রে নয়, বরং শর্তহীনভাবে

অন্যান্য সকলের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। বিপরীতভাবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো সেই মানুষ যে তার মন্দ ক্ষমতার চর্চা করে যেমন নিজের প্রতি তেমনি অন্যান্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কে যে সদগুণ তাই হল ন্যায়বিচার, যা শর্তনিরপেক্ষ এক বিশেষ ধরনের অবস্থা, যার দ্বারা সমাজের সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হয়। এজন্য অ্যারিস্টটল ন্যায়বিচারকে সকল সদগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে বিবেচিত করেছেন।

৪) অ্যারিস্টটল উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার ন্যায়বিচারের আলোচনা -ঃ

অ্যারিস্টটলের মতে প্রাথমিকভাবে ন্যায়বিচারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় -

ক) সর্বজনীন ন্যায়বিচার খ) বিশেষ ন্যায়বিচার

ক) সর্বজনীন ন্যায়বিচার (Universal Justice) -ঃ সর্বজনীন ন্যায়বিচারকে তিনি সকল সদগুণের সাথে বৃহত্তর অর্থে সম্পৃক্ত করেন অর্থাৎ সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। “Universal justice is that state of a person who is generally lawful and fair.”¹¹। অ্যারিস্টটল সর্বজনীন ন্যায়বিচার বলতে বুঝিয়েছেন ব্যক্তির এমন এক চারিত্রিক অবস্থা যার দ্বারা ব্যক্তি সাধারণভাবে ন্যায়পরায়ণ ও আইনসম্মত আচরণ করে থাকে।

খ) বিশেষ ন্যায়বিচার (Particular Justice) -ঃ বিশেষ ন্যায়বিচার যেমন বিশেষ বিশেষ গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অবস্থাকেও বিবেচনার

¹¹ Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction*, 193.

অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষ ন্যায়বিচার আলোচনা করে ‘সম্মান’, ‘অর্থ’, ‘নিরাপত্তা’ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে, যেগুলিকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে লাভ-ক্ষতির সম্পর্ক নিহিত থাকে। “Particular justice deals with the “divisible” goods of honour, money, and safety, where one person’s gain of such goods results in a corresponding loss by someone else.”¹²। এই বিশেষ ন্যায়বিচারকে তিনি দুইভাগে ভাগ করেছেন – অ) বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার আ) সংশোধনমূলক ন্যায়বিচার

অ) বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার (Distributive Justice) –ঃ বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সম্মান বা পুরস্কার প্রদান করে। “Distributive Justice is for someone to distribute to individuals goods that are taken from a common stock.”¹³। তবে ‘যোগ্যতা’কে কোন্ বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। গণতন্ত্রবাদীরা বলেন যোগ্যতা নির্ধারিত হবে সংস্কারমুক্ত মানুষের মর্যাদার ভিত্তিতে, স্বেচ্ছাচারবাদীদের মতে, যোগ্যতা নির্ধারিত হবে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের ভিত্তিতে ও সম্পদের ভিত্তিতে, আর যারা অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করে তাঁদের মতে এই যোগ্যতা নির্ধারিত হবে অর্জিত উৎকৃষ্টতার ভিত্তিতে। তবে যেভাবেই যোগ্যতা নির্ধারিত হোক না কেন বণ্টনকে ন্যায্য হতে গেলে তা সমমানের হওয়া প্রয়োজন। কারণ যে কোন কর্মেরই অধিক বা অল্প পরিমাণ হওয়ার যেমন অবকাশ থাকে, তেমনি সেক্ষেত্রে সমপরিমাণ হওয়ারও অবকাশ থাকে। ন্যায় হতে গেলে দুটি অসাম্যের মধ্যবর্তীতে

¹² Pakaluk, *Aristotle’s Nicomachean Ethics An Introduction*, 194.

¹³ *Ibid.*, 196.

অবস্থান করতে হবে। প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার দুইজন ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, আর যে বস্তু বা কর্মের মধ্যে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রেও বন্ডিত থাকে দুটি বিষয় বা কর্ম। সুতরাং ন্যায়বিচার হল তাই যা সমানুপাতিকভাবে চারটি প্রান্তীয় সত্তাকে নিয়োজিত করে। আর যা এই সমানুপাতিক সাম্যটি অমান্য করে তাকে অন্যায় বলা হয়।

আ) সংশোধনমূলক ন্যায়বিচার (Corrective Justice) -ঃ সংশোধনমূলক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান দোষী ব্যক্তিবর্গের শাস্তির বিধান দেয়। যেমন- কেউ যদি অন্যায়ভাবে কিছু সুবিধা ভোগ করে তাহলে সংশোধনমূলক ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে সাম্যতা বজায় রাখতে হবে। “Corrective Justice is for a judge to correct for an inequality that is created through an act of injustice, by taking goods away from the offender and restoring goods to the victim, or by simply punishing the offender.”¹⁴। সংশোধনমূলক ন্যায় ইচ্ছামূলক ও অনিচ্ছামূলক উভয় প্রকার আদান-প্রদানের সাথে সম্পর্কিত থাকে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই সমমর্যাদা প্রদানের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংশোধনমূলক ন্যায়বিচারের বিবেচনার বিষয় হল - কে অন্যায় করেছে ও কার উপর অন্যায় করা হয়েছে এবং কে ক্ষতিসাধন করেছে ও কার উপর ক্ষতিসাধন করা হয়েছে তা বিচার করা। বিচারক এক্ষেত্রে চেষ্টা করেন শাস্তির মাধ্যমে সমতা বিধান করতে। যেমন - যে অন্যায় করেছে তার নিকট হতে লাভের

¹⁴ Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction*, 196.

বা সুবিধার কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে যার উপর অন্যায় করা হয়েছে তাকে সেই সুবিধা প্রদান করা। সুতরাং বলা যায় যে, সংশোধনমূলক ন্যায়বিচার হল একপ্রকার লাভ ও ক্ষতির মধ্যবর্তী এক সমানুপাতিক অবস্থা।

বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার ও সংশোধনমূলক ন্যায়বিচার ছাড়াও অ্যারিস্টটল আরও দুই প্রকার ন্যায়বিচারের- রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ও বিনিময় ন্যায়বিচারের উল্লেখ করেছেন।

রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (Political Justice) -ঃ রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের অস্তিত্ব থাকে এমন মানুষদের মধ্যে যারা সংস্কারমুক্ত, এবং প্রত্যেকেই একে অন্যের সাথে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে সমান এবং যাদের পারস্পারিক সম্পর্কসমূহ সরকারের আইন দ্বারা অনুশাসিত হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ স্বভাববশে বা প্রকৃতিগতভাবে রাজনীতিক জীব। মানুষের স্বভাবের মধ্যে রাজনৈতিক জীবরূপে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলেই মানুষ কালক্রমে রাষ্ট্র গঠন করে নিজেকে রাজনৈতিক জীবরূপে বিকশিত করে। ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে এবং রাষ্ট্রের সেই লক্ষ্য হল, মানুষের পরম কল্যাণ সাধন ও তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন। রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করেই মানুষ সৎ ও সুখী জীবনযাপন করতে পারে, এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মাধ্যমেই ব্যক্তি তার নিজ লক্ষ্য চরিতার্থ করতে পারে। তাই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের দ্বারা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত সাম্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

বাণিজ্যিক বা বিনিময় ন্যায়বিচার (Commutative Justice) -ঃ বিনিময় ন্যায়বিচারকে 'দ্বিপক্ষীয় সমতা' বলে অভিহিত। এটি বণ্টনমূলক বা সংশোধনমূলক কোন প্রকার ন্যায়ের সাথে যুক্ত নয়। বিনিময় ন্যায় কোন সমানুপাত অনুসারে বা পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে সমপরিমাণ প্রতিদান ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, বরং বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ও মানুষের মধ্যে সহায়তামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে দ্বিপক্ষীয় সমতার কথা বলা হয়। তবে বিনিময় ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হল - যে সকল বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা হবে সেগুলির মধ্যে কোন না কোন প্রকারে তুলনায়োগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে একধরনের পরিমাপ সাম্যতা বজায় রাখা উচিত। যেমন- কতগুলি বস্তুর যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের সমান হিসেবে ধরা হয় তবেই সেই বস্তুর তৈরীকারী ও খাদ্য উৎপাদনকারীর মধ্যে বিনিময়যোগ্যতা থাকবে। তবে এই আদান-প্রদানের সম্পর্কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের চাহিদা- যা সকল জিনিসকে একত্রে ধরে রাখে। যদি আমাদের সমাজে কোন উৎপাদিত বস্তুর প্রতি চাহিদা না থাকতো তাহলে একে অপরের সাথে লেনদেন বা বিনিময় প্রথা থাকত না। যদিও বর্তমানে মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় তা সমস্ত জিনিসের লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে তথাপি এটা সুস্পষ্ট যে, মুদ্রা প্রচলনের পূর্বে এভাবেই বিনিময় প্রথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান সম্পর্ক থাকত। যার ফলে সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংহতিমূলক সহাবস্থানের সম্পর্ক বজায় থাকত। কোন রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে হলে সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজন হয়। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা না থাকলে সেই রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। তাই বিনিময় ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সকল

ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংহতিমূলক সহাবস্থানের সম্পর্ক বজায় থাকায় সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপরিউক্ত মতবাদগুলি আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে বিভিন্ন প্রকার ন্যায়বিচারের আলোচনার মাধ্যমে অ্যারিস্টটল সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে Equality বা সাম্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। সুতরাং ন্যায়বিচার হলো তাই যা সমতাবিধান করে এবং এই সমতাবিধান অনুসরণকারী ব্যক্তিকে বলা হয় ন্যায়পরায়ণ। আর অন্যায়ী হল সেই ব্যক্তি যে সমতাবিধান নিয়মটি অমান্য করে।

প্রশ্ন হল - কোন ব্যক্তি ন্যায়নীতি অনুসরণ করলেই কি ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত হবে? এবিষয়ে বলা যায় যে, 'ন্যায়নীতি' ও 'ন্যায়কাজ' এর মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমন 'অন্যায়নীতি' ও 'অন্যায়কাজ' এর মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকৃতিগতভাবে বা কৃত-বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে কোন একটি নীতি 'ন্যায়' বলে গণ্য হয়, আর এই নীতি অনুসরণ করে কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজ সম্পাদন করে তখন সেটাকে 'ন্যায়কাজ' বলা হয়। একইভাবে প্রকৃতিগতভাবে বা কৃত-বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে কোন একটি নীতিকে অন্যায় বলে গণ্য করা হয়, এবং কোন ব্যক্তি যখন ঐ নীতি দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন করবে তখন সেই কাজকে বলা হয় অন্যায়কাজ। কিন্তু অন্যায়কাজ করলেই কর্মকর্তাকে অন্যায়ী বলা যায় না অর্থাৎ অন্যায়রূপে কাজ করা যেহেতু আবশ্যিকীয়ভাবে নির্দেশ করে না অন্যায়ী হওয়াকে, সুতরাং কি প্রকারের অন্যায় কর্মসমূহের দ্বারা কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি অন্যায়ী হবে সেটা আমাদের বুঝতে হবে।

অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী কোন কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কাজটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে করেছে নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছে তার ভিত্তিতে বলা যাবে যে ব্যক্তিটি ন্যায়পরায়ণ অথবা ন্যায়পরায়ণ নয়। স্বেচ্ছাকৃতকর্ম বলতে অ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন, যে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন থাকে এবং স্বজ্ঞানে অর্থাৎ কোন অজ্ঞতার বশবর্তী না হয়ে যে কর্মটি করা হবে সে সম্পর্কে, যে উপায়ে কর্মসম্পাদন হবে সে সম্পর্কে ও যে লক্ষ্য অর্জিত হতে যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে যদি ব্যক্তি সচেতন থাকে, তবে কর্মকর্তার ঐ কর্মকে স্বেচ্ছাকৃতকর্ম বলা হয়। এইরূপে স্বেচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন ব্যক্তি ন্যায়কাজ করে তবে সেই ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন অন্যায় কাজ করে তবে সেই ব্যক্তি হবে অন্যায়ী বা ন্যায়পরায়ণতাহীন।

সুতরাং অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মন্দ ব্যক্তি সে নয়, যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় বরং মন্দ হল সেই ব্যক্তি যে হিংসাত্মক কাজ করার জন্য তার ক্রোধকে জাগ্রত করে। একইভাবে বাধ্যতামূলকভাবে বা সমাজের সকলের থেকে প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ন্যায়সঙ্গত কাজ করে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলা যায় না বরং যে ব্যক্তি কোন শর্তনিরপেক্ষভাবে ও কোন ফললাভের আশা ব্যতীত স্বেচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়সঙ্গত কাজ করে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলা হয়। এরূপ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। এবং সমাজস্থ সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গের

मध्ये साम्य, सौभद्रत्वबोध प्रतिष्ठांर माधुमे समाज ँ राष्ट्रैर सर्वाङ्गीण मङ्गल साधित
हुरे।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত (মধ্যযুগ থেকে
সমসাময়িক) আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়বিচার সম্পর্কে (মধ্যযুগ থেকে সমসাময়িক দার্শনিকদের) আলোচনা

ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের আলোচনায় সেন্ট অগাস্টাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩২৪ বঙ্গাব্দে উত্তর আফ্রিকার রোম সাম্রাজ্যে অগাস্টাইন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ের খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক ও দার্শনিক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে সুবিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছিলেন।

১) ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সেন্ট অগাস্টাইনের মতবাদ –৪ তৎকালীন রোমান নাগরিকগণ পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ‘পৌত্তলিকতাবাদ’ শব্দটি মূলত একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, গ্রীক-রোমান বহুদেববাদ হিসেবে ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার খ্রীস্টান ধর্মের প্রসারের আগে বহু ঐশ্বরবাদী ধর্মীয় ঐতিহ্যে ব্যবহার করা হয়। সামাজিক কার্যকলাপ বা বিধি-নিষেধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই মতবাদ শাস্ত্র বিধানের (Eternal Law) নিয়মাবলী মেনে চলত। এই মতবাদে মনে করা হত - যেহেতু মানুষ অপূর্ণ তাই তার পক্ষে কখনই সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক শক্তিকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না সুতরাং অপূর্ণ মানুষের পরম সত্যকে লাভ করার চেষ্টা বিফল বাসনামাত্র। অগাস্টাইন প্রচলিত পৌত্তলিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের দুর্নীতি, অত্যাচার ও পতিতাবস্থা তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি অনুভব

করেছিলেন যে, সমাজকে কলুষমুক্ত করতে হলে মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা, ও সহানুভূতির ভাব জাগ্রত করতে হবে। এই সময়ে খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের ইশ্বরের করুণা লাভের জন্য মানুষকে একে অপরের প্রতি সহনশীল হওয়ার নির্দেশ ও সর্বজনে প্রেম বিতরণের আদর্শ অগাস্টাইনকে খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। ব্যক্তি সর্বজনে প্রেম বিতরণের মাধ্যমেই প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে, এবং ধার্মিক ব্যক্তি নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। আর পাপী বা অন্যায়ী ব্যক্তি হল সে, যে ইশ্বরের আদেশ অমান্য করে থাকে। “Righteousness is identified with mercy as well as with justice and involves our relationship with God as well as with fellow humans. Both the Old Testament and New Testament call for just behaviour on the part of righteous people, with injustice, begin a sin against God’s Law.”¹

খ্রিষ্টীয় ধর্মমতে, সমস্ত কিছুর মূল কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হলেও মানুষের বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদে বলা হয়, মানুষ তার বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষ ঘটিয়ে পরম সত্যকে জানতে সক্ষম হবে। এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বিচারশক্তির দ্বারা জাগতিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এক সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। খ্রিষ্টীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অগাস্টাইন বলেন যে, একমাত্র এই সমাজের মধ্যেই প্রকৃত ন্যায় খুঁজে পাওয়া যাবে। সমাজকে সুসংহত ও শান্তিপূর্ণভাবে

¹ O.S.A Kolawole Chabi, “Augustine on Justice: Theory and Praxis”, *An African Journal of Arts and Humanities* 1, No 2. (September 2015): 21.

বসবাসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি দুই প্রকার বিধান বা নীতি স্বীকার করেছেন-

ক) শাস্ত্র বিধান যা নিত্য ও চিরন্তন খ) রাষ্ট্রীয় বিধান যা আধুনিক ও ক্ষণস্থায়ী।

ক) শাস্ত্র আইন (Eternal Law) :- শাস্ত্র আইন হল ঈশ্বরকৃত আদেশ বা নিয়মাবলী, যার দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তু তার নিজস্ব রীতিতে যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা উচিত ঠিক সেভাবেই তারা বিন্যস্ত থাকে। “Eternal Law is the law by which it is just that everything should have it’s due order”²। অগাস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে চার্চ ই হল ঈশ্বর সৃষ্ট শাস্ত্র বিধানের রক্ষাকারী আর এই শাস্ত্র বিধানকে জানার জন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তির নিজেকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এবং নিজেকে উপলব্ধির দ্বারাই জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা উপলব্ধি করতে পারবে। এমন ব্যক্তিই হল প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ) রাষ্ট্রীয় আইন (Civil Law) -ঃ সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহকে রাষ্ট্রীয় আইন বা বিধান বলা হয়। অগাস্টাইনের মতে, রাষ্ট্রীয় বিধান যদি ঈশ্বরীয় বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবেই তা ন্যায়সঙ্গত বলে গন্য হবে, আর যদি ঈশ্বরীয় বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা ন্যায়বিরোধী আইন বলে গন্য হবে এবং নাগরিকগণ সেই বিধান মানতে বাধ্য থাকবে না। তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেই ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে, আর তা সম্ভব হয় একমাত্র চার্চের

² Teresa Delgado, John Doody, and Kim Paffenroth, eds., *Augustine and Social Justice* (USA : Lexington Books, 2015), 12.

মাধ্যমেই। তাই যে সমাজ বা রাষ্ট্রে ঈশ্বরের পূজাচর্চা হয় না সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সুতরাং অগাস্টাইনের মতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষের প্রথমে নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তির দেহ ও মনের সাথে বা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য অন্তর্নিহিত আছে তা উপলব্ধি করতে হবে। এবং ব্যক্তি যদি নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবেই সে সমাজের অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। এইরূপে অন্তরের দিব্যশক্তির দ্বারা প্রকৃতভাবে নিজেকে উপলব্ধি সম্ভব হবে একমাত্র ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা। বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারা নিজ অন্তরে ঈশ্বরকে ভালবাসাই হল ঈশ্বরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন। ফলে ঈশ্বর প্রেমের মাধ্যমে সর্বজনে প্রেম ও দয়া জাগ্রত হবে। এইরূপ ব্যক্তিই হবে প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণ যার দ্বারা সমাজের একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতিবোধ জাগ্রত হবে। ফলে সকলে অন্তিম লক্ষ্য – ঈশ্বরপ্রেম ও করুণা লাভ করতে পারবে। “Rightly related to God, man is properly related within himself and to the external world of people and things. Not only thus justice produce harmony with man, peace among men, but like other moral virtues, its value lies in preparing us for the vision of God. This vision begins now with an understanding of what we believe. To the just man belongs this understanding.”³। অগাস্টাইনের মতে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের জন্য সর্বোত্তম ভালো কিছু লাভ করতে পারি এবং যেহেতু আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র তাই ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ হল সমাজের সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সকলের প্রতি

³ Delgado, Doody and Paffenroth, eds. *Augustine and Social Justice*, 14.

সৌহার্দপূর্ণ আচরণ। এই আচরণ তখনই প্রকাশ পাবে যখন মানুষ নিজের জন্য ও অপরাপর ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম ভাল বস্তুটি পছন্দ করবে ও সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করবে। ফলে সমাজের অন্তর্গত সকল নাগরিকই একে অপরের প্রতি দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে, তখন আর অন্যের প্রতি অন্যায়, অবিচার হবে না। এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের মাধ্যমে ব্যক্তি তার চরম লক্ষ্য বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করতে পারবে। এভাবে অগাস্টাইন সমাজের সকল মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, যেখানে জাতীয়তাবোধ নেই, প্রতিবেশীদের সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতিবোধ নেই সেখানে ন্যায়বিচার থাকতে পারে না। মানব সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও অশান্তির মূল কারণ হল মানুষের দুর্বলতা এবং অজ্ঞতা। ঈশ্বর মানুষকে যে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছে তার অপব্যবহারের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কৃপা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধির মাধ্যমেই মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বরের উপলব্ধি বোঝায় না, বরং ঈশ্বরের উপলব্ধির মাধ্যমে এক সর্বজনীন ঐশ্বরিক নির্দেশ বা নিয়ম(Divine Law) মেনে নেওয়াকে বোঝায় যার দ্বারা বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র দূরীভূত হয়ে সকলে এক সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

২) ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মতবাদ –ঃ মধ্যযুগের ধর্মশাস্ত্রবিদ দার্শনিকদের মধ্যে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি সিসিলির অন্তর্গত অ্যাকুইনো নামক স্থানে ১২২৪ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময় সিসিলির রাজনৈতিক উত্থান পতন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মধ্যযুগের সূচনাপর্ব থেকেই ধর্ম, রাজনীতি ও বিদ্যাবিষয়ক ধ্যানধারণা প্রকাশ পেলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। গির্জা সংকীর্ণতার পথ পরিহার করে বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হয়, জ্ঞান চর্চায় জনগনের উৎসাহ বেড়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এক ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ঘটে এবং ধর্ম ও দর্শনের মিলনে এক যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অ্যাকুইনাসের মধ্যেও আমরা এই প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি। তাঁর লক্ষ্য হল ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিক বিচারের যোগসাধন ঘটিয়ে ধর্মকে যা মূলত বিশ্বাস নির্ভর, সাধারণ মানুষের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা। অতীতে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে একটা কাল্পনিক বিরোধের কথা বলা হত, অ্যাকুইনাস তা অস্বীকার করে বলেন যে, বিশ্বাস, জ্ঞান ও যুক্তি সবই ঐশ্বরিক উৎস থেকে আগত। সুতরাং এগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁর মতে বস্তু জগতে যত বৈচিত্র্য থাকে না কেন ঈশ্বর ও প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদিতা অন্তর্ভুক্ত আছে, যদিও তা সমপরিমাণে থাকে না এবং এই যুক্তিবাদিতার মাত্রা অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আর যখন সমাজের প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ স্থান ও কর্তব্য অনুসারে পূর্ণতা ও যুক্তিবাদিতা অনুযায়ী নিজের নিজের দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে তখনই সেই ব্যক্তি ন্যায্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। অ্যাকুইনাসের মতে, মানুষের চিন্তাশক্তি দুটি দিক আছে- অ) জ্ঞানগত দিক এবং আ) প্রবৃত্তিগত দিক।

অ) জ্ঞানগত দিক -ঃ জ্ঞানগত দিক বলতে বোঝায় যা বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের বাহ্যিক জগতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করে এবং ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

আ) প্রবৃত্তিগত দিক-ঃ প্রবৃত্তিগত দিক বলতে বোঝায় ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যার দ্বারা ব্যক্তি তার চাহিদার বিষয়বস্তুর প্রতি প্রবৃত্ত হয়। মানুষের প্রবৃত্তি যেহেতু সর্বদা সুখদায়ক বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তাই প্রশ্ন হল যে - চরমতম সুখ লাভের জন্য ব্যক্তির কী কাজ করণীয়?

এক্ষেত্রে প্লেটো, ও অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে অ্যাকুইনাস বলেন যে মানব মনের চারটি সদগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই সেই চরম সুখ লাভ করা যেতে পারে। এই চারটি সদগুণ হলো - ১) জ্ঞান (wisdom) ২) সাহসিকতা (courage) ৩) আত্মসংযম (self control) ও ৪) ন্যায়বিচার (justice)।

ন্যায়বিচার বলতে অ্যাকুইনাস বুঝিয়েছেন এমন একটি সদগুণ যার দ্বারা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকে এবং যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝে দেওয়া হয়। “The virtue of justice, however, governs our relationships with others. Specifically, it denotes a sustained or constant willingness to extend to each person what he or she deserves.”⁴

অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনিও ন্যায়বিচারের ধারণাকে দুটি পৃথক ভাবে বিন্যস্ত করেছেন-

⁴ Shawn Floyd, “Thomas Aquinas: Moral Philosophy”, *The Internet Encyclopedia of philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/aq-moral>. (accessed january 2019).

ক) সর্বজনীন ন্যায়বিচার এবং

খ) বিশেষ ন্যায়বিচার

ক) সর্বজনীন ন্যায়বিচার -: অ্যাকুইনাসের মতে সর্বজনীন ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য হলো সকলের মঙ্গলের স্বার্থে ব্যক্তি তথা সমাজের কাজকর্ম কেমন হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা। তিনি বলেন যেহেতু ব্যক্তি সমাজের ক্ষুদ্র অংশ তাই সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে। আর যদি কোন কাজ ব্যক্তি স্বার্থের বিরোধী হয় তাহলে তার ফলে সমাজেরও অমঙ্গল সাধিত হবে। তাই এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে ব্যক্তি তথা সমাজের সকলের কল্যাণ সাধিত হয়। “justice is a general virtue which concerns not individual benefits but community welfare. According to Aquinas, everyone who is a member of a community stands to that community as a part to a whole. Whatever affects the part also affects the whole. And so whatever is good (or harmful) for oneself will also be good (or harmful) for the community of which one is a part.”⁵।

খ) বিশেষ ন্যায়বিচার-ঃ বিশেষ ন্যায়বিচার হলো তাই যার দ্বারা ব্যক্তি সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের স্বার্থে কাজ করে না বরং সে তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যেমন পরিবার ও প্রতিবেশীর স্বার্থে কাজ করে থাকে। “particular justice directs us not to the good of the community but to the good of individual neighbors, colleagues, and other people with whom we interact regularly.”⁶। এক্ষেত্রে অবশ্য ওই সব

⁵ Shawn Floyd, “Thomas Aquinas: Moral Philosophy”, *The Internet Encyclopedia of philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/aq-moral>. (accessed January 2019).

⁶ Ibid.

ব্যক্তিদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। অ্যাকুইনাসের মতে বিশেষ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত সদস্যের মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে পরক্ষোভাবে সমাজেরও মঙ্গল সাধন করে থাকে। বিশেষ ন্যায়বিচারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে – অ) বিনিময়মূলক ন্যায়বিচার ও আ) বন্টনমূলক ন্যায়বিচার।

অ) বিনিময়মূলক ন্যায়বিচার –ঃ বিনিময়মূলক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজে একে অপরের সাথে আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বিনিময়যোগ্য বস্তুর একটা মূল্য থাকে যে মূল্যের ভিত্তিতে সাম্যতা বজায় রেখে পণ্যবস্তুর আদান প্রদান করা হয়।

আ) বন্টনমূলক ন্যায়বিচার –ঃ বন্টন মূলক ন্যায়বিচার বলতে অ্যাকুইনাস বুঝিয়েছেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকারের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু বন্টন করা। এক্ষেত্রে তিনি বলেন যেহেতু প্রত্যেকের অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই প্রত্যেকের চাহিদা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভিত্তিতে বস্তু বিষয়বস্তুর বন্টন করতে হবে।

এই দুই প্রকার ন্যায়বিচারের মূল উদ্দেশ্য হলো যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তার স্থান ও যোগ্যতা অনুযায়ী সাম্যতা বজায় রাখা যার ভিত্তিতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অ্যাকুইনাসের মত-ঃ সমাজে ন্যায়বিচার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা আলোচনা করতে গিয়ে অ্যাকুইনাস প্রথমে সমাজের স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন সমাজের কতগুলো উদ্দেশ্য আছে এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হয় নিম্ন পর্যায়ের মানুষেরা উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের সেবা দান ও উচ্চ স্তরের মানুষেরা নিম্ন স্তরের লোকদের নির্দেশ দানের মাধ্যমে। তিনি বলেন যে, সৎ জীবনযাপনের নিমিত্তে সমাজের বিভিন্ন মানুষের পরিষেবার বিনিময় একান্ত

প্রয়োজন। কোন ব্যক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেককেই একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয় আর এই নির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে কখনো কল্যাণ সাধন হতে পারে না। অ্যাকুইনাসের মতে সমাজের গঠন প্রশাসন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি সবকিছু সর্বশক্তিমান ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয়। সমাজকে নৈতিকতাসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল করে তোলার উদ্দেশ্যে ভগবান শাসক তৈরি করেছেন অতএব কোন অবস্থায় শাসক এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন না। শাসক এমনভাবে শাসন করবেনা যাতে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রশাসন এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে প্রতিটি শ্রেণী সুখী ও সৎ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। “rulership is an office or a trust for the whole community, His power is a ministry or a service owed to the community of which he is head.”⁷। আর এই প্রশাসন পরিচালনার জন্য সকার গঠন করা হয়। তিনি বলেন প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও ন্যায়বোধ প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে থাকে না তাই এগুলি সম্পর্কে যারা বেশী সচেতন তারা এই সমস্ত সদৃশ্যগুলি সকলের মধ্যে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং এইভাবেই জন্ম নেয় সরকার। একজন শাসক যদি কেবল নিজের কল্যাণ বা উপকারের জন্য সরকার গঠন করে এবং জনগণের কল্যাণ উপেক্ষা করে তাহলে সেই সরকারকে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এক্ষেত্রে জনগণের সমর্থন থাকে না। অ্যাকুইনাসের মত অনুযায়ী স্বৈরতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র খারাপ ধরনের সরকার। পক্ষান্তরে ভাল জাতীয় সরকার হল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত কল্যাণের কথা

⁷ Martin Christopher, *The philosophy of Thomas Aquinas Introductory Reading* (London : Macmillan, 1988), 27.

না ভেবে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রাজ্যশাসন করা হয়। ভাল ও খারাপ উভয় প্রকারের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করার পর অ্যাকুইনাস রাজতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশী কাম্য সরকার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে শাসকের মুখ্য দায়িত্ব হবে যাদের শাসন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের কল্যাণ সাধন করা, যার ফলে সমাজের শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। “The aim of any ruler should be directed towards securing the welfare of that which he undertakes to rule”⁸।

সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের ভূমিকা -ঃ সৎ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অ্যাকুইনাস যথেষ্ট বলে মনে করেননি এর জন্য প্রয়োজন বিধিবদ্ধ আইনসমূহ। তিনি আইন বলতে বুঝিয়েছেন ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি ও নিয়ম, যে পদ্ধতি ও নিয়মের দ্বারা মানুষ কোন কাজ করতে প্রলুব্ধ হয় অথবা কোন কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তিনি বলেন রাষ্ট্র হল মানুষের সঙ্গবদ্ধতার ফল, আর এই সঙ্গবদ্ধতা ঠিকমত কাজ করতে পারে না, যদি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি না থাকে এবং এটি সম্ভব কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি আইনকে সমাজকল্যাণ বাস্তবায়িত করার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন।

আইনকে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন - ক) শাস্বত আইন খ) প্রাকৃত আইন গ) ঐশ্বরিক আইন ঘ) মনুষ্যকৃত আইন।

ক) শাস্বত আইন -ঃ অ্যাকুইনাসের মতে শাস্বত আইন ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বিচারবুদ্ধি প্রায় সমার্থক। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাই শাস্বত আইনের আকারে পার্থিব সমাজে প্রচলিত। শাস্বত আইনকে তিনি সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা দিয়েছেন। এই আইনের নির্দেশে

⁸ Martin Christopher, The philosophy of Thomas Aquinas, 28.

অন্যান্য আইনকে মেনে চলতে হয়। যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সদাচার মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই এই ক্ষমতা বলে তিনি শাস্ত্রত আইনে অংশগ্রহণ করতে পারে। অতএব শাস্ত্রত আইনকে সমাজ বহির্ভূত কোনো বিষয় বলে মনে করা অনুচিত। “... that the whole community of the universe is governed by Divine Reason. Wherefore the very Idea of the government of things in God the Ruler of the universe has the nature of law. And since the Divine Reason's conception of things is not subject to time but is eternal, therefore it is that this kind of law must be called eternal.”⁹।

খ) **প্রাকৃত আইন** -ঃ মানুষের কাজকর্মের ক্ষেত্রে যখন ঐশ্বরিক যুক্তি বা প্রজ্ঞার প্রতিফলন দেখা যায় তখন তাকে আমরা প্রাকৃত আইন বলি। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক বিচার-বুদ্ধি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ব্যবহারিক বিচার-বুদ্ধি বলতে অ্যাকুইনাস বুঝিয়েছেন যে, মানুষ সবসময় সৎ ও ভালোকে গ্রহণ এবং অন্যায় ও খারাপকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় থাকে। আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় অগ্রাধিকার পায়। ভগবান মানুষকে যে স্বাভাবিক প্রবণতা ও গুণাবলী দিয়েছেন সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তি তৎপর থাকে, এবং একমাত্র স্বাভাবিক আইনের দ্বারাই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

গ) **ঐশ্বরিক আইন** -ঃ অ্যাকুইনাস মনে করতেন মানুষের জ্ঞান বা যুক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে ত্রুটিহীন নয় তাই যাবতীয় অপার্থিব ক্রিয়াকলাপে তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য ঐশ্বরিক ধারণা বা জ্ঞান বাইবেলের মাধ্যমে জনগণের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এই ঐশ্বরিক ধারণা বা চিন্তার উদঘাটনই ঐশ্বরিক আইন নামে পরিচিত। “.....it

⁹ Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica* (<https://archive.org>), 1333.

is by law that man is directed on how to perform his proper acts in view of his last end. And indeed if a man were ordained to no other end than that which is proportionate to his natural faculty, there would be no need for man to have any further direction of the part of his reason, besides the natural law and human law which is derived from it. therefore it was necessary that, besides the natural and the human law, man should be directed to his end by a law given by God.”¹⁰ অ্যাকুইনাসের মতে, ঐশ্বরিক আইনের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তার যথাযথ কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়। বিচারবুদ্ধির সীমাবদ্ধতা হেতু মানুষে মানুষে বিরোধ দেখা দেয়, এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হয়। ঐশ্বরিক আইন হল তাই যার দ্বারা এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। তাই প্রাকৃতিক আইন ও মনুষ্যকৃত আইনের পাশাপাশি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সমাজের শান্তি বজায় রাখার জন্য ঐশ্বরিক আইনের প্রয়োজন আছে।

ঘ) মনুষ্যকৃত আইন –ঃ সৎ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অ্যাকুইনাস যথেষ্ট বলে মনে করেননি, এর জন্য প্রয়োজন বিধিবদ্ধ আইনসমূহ যাকে মনুষ্যকৃত আইন বলা হয়। বিশেষ করে যারা পাপী তাদের ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার এবং এই কাজ কেবল মনুষ্যকৃত আইন করতে পারে। তবে কেবলমাত্র শাস্তি প্রদান নয়, ঐশ্বরিক যুক্তিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যও তিনি মনুষ্যসৃষ্ট আইন প্রণয়নের কথা বলেছেন।

সুতরাং বলা যায় যে, আইন সম্পর্কিত অ্যাকুইনাসের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি ভগবাণ বা অতি-প্রাকৃত বিষয়কে আইনের অন্তর্ভুক্ত

¹⁰ Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, 1336.

করেছেন তথাপি এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি আইনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতাকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

৩) ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কান্টের আলোচনা –ঃ মধ্যযুগের পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কান্ট তাঁর ‘Groundwork of the Metaphysics of Morals’ গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন- ক) তাত্ত্বিক বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি খ) ব্যবহারিক বুদ্ধি। তাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার চর্চা হয়, আর ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা নৈতিক নিয়ম নির্ধারিত হয়। কান্টের মতে, সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজ নিজ কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। তিনি বলেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সকলের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে যে আমাদের কি করা উচিত? এবং একজন ব্যক্তির তাই করা উচিত যা ব্যক্তি তার নিজের নিকট ও সমাজের অন্যান্য সকল মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করবে। তিনি পূর্ববর্তী দার্শনিক অগাস্টাইন ও অ্যাকুইনাসের মতো ঈশ্বর প্রেম বা বাহ্যিক কোন কারণের দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার না করে, কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে বলেছেন। কান্টের মতে, কোন কর্মকে উচিত কর্ম বলা যাবে যদি তা স্বতঃমূল্যবান ও সার্বভৌম নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করে। এই সার্বভৌম নৈতিক নিয়মটি কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মের কথা বলেছেন। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মানুসারে- এমন কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাকে একটি সার্বজনীন নিয়ম রূপে কামনা

করা যেতে পারে। কান্টের মতে নৈতিক নিয়ম অবশ্যই সর্বজনীন হওয়া উচিত। তিনি সর্বজনীনযোগ্যতা বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নৈতিক নিয়মগুলো সবক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। “কান্টের মতে সর্বজনীনযোগ্যতার তিনটি অর্থ রয়েছে- যৌক্তিক সর্বজনীনযোগ্যতা, সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা।”¹¹

যৌক্তিক সর্বজনীনযোগ্যতা -ঃ যৌক্তিকভাবে কান্টের এই নীতিটি যে কোন প্রকার মূল্যায়নমূলক ও পরামর্শমূলক অবধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- গরীবকে সাহায্য করা উচিত, নির্দোষ ব্যক্তিকে আঘাত করা অন্যায্য, হত্যা করা অনৈতিক, এই ধরনের সকল মূল্যায়নমূলক বাক্যসমূহ সর্বজনীন মানদণ্ড হওয়ার যোগ্য।

সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা -ঃ কান্টের মতে, একটি নীতি যদি সকল নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য হতে পারে, কেবলমাত্র তখনই সেই নীতিটি নৈতিক নিয়মে পরিণত হতে পারে। কাজেই একটি নিয়ম কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তির জন্য নৈতিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয় তাহলে সেই নিয়মটি একই পরিস্থিতিতে সমাজের অন্যান্য সকল মানুষের জন্য সর্বজনীন কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। কান্টের মতে, কোন নৈতিক নিয়ম সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তা নৈতিক বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা -ঃ একটি নৈতিক নিয়ম সর্বজনীন বলে গণ্য হওয়ার জন্য যৌক্তিক ও ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা থাকার পাশাপাশি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য হওয়া

¹¹ এ. এস. এম. আব্দুল খালেক, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা (ঢাকা : অনন্যা, ২০০৯), ১২০।

আবশ্যিক। সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি বলতে আচরণের এমন নৈতিক নিয়মকে বোঝায় যে নিয়ম আদর্শনিষ্ঠ নিয়ম হিসেবে স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সকল মানুষ সমান ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ নিয়মটি এমন হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন স্বাধীনভাবে ও স্বজ্ঞানে এই নিয়ম অনুসারে কাজ করাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। সুতরাং কান্ট উল্লিখিত নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনতার বিভিন্ন অর্থগুলি আলোচনা করে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যখন সর্বজনীন নৈতিক নিয়মানুযায়ী কোন কাজ বা আচরণ করে থাকে তখন সেই ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বলা হয়। এবং এরূপ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কান্টের মতবাদ বুঝতে গেলে কান্টের নৈতিক মতবাদ আলোচনা করা প্রয়োজন। বস্তুত কান্টের নৈতিক মতবাদ তিনটি বিবৃতির উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল -

ক) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ (Good will alone is good)

খ) কর্তব্যই কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য (Duty for the sake of duty)

গ) নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ (Moral law is a Categorical Imperative)

ক) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ -ঃ ইমানুয়েল কান্টের মতে একমাত্র সদিচ্ছাই নিঃশর্ত ভালো, সদিচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা নিঃশর্ত ভালো নয়। কোন কাজ যখন সদিচ্ছার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে করা হয় তখন সেই কাজকে ভালো কাজ বলা হয় কিন্তু কোন কাজ যদি মন্দ ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে করা হয় তখন আর সে কাজকে ভালো

কাজ বলা হয় না বরং কাজটি মন্দ বলে গণ্য হতে বাধ্য হয়। যদিও একথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চাননি যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সদিচ্ছা ছাড়া অন্যান্য যেসকল গুণগুলো রয়েছে যেমন- বুদ্ধি, সচেতনতা, সদ্গুণ ইত্যাদি ভালো বলে গণ্য হতে পারে না, তাঁর মতে এগুলো কেবলমাত্র তখনই ভালো বলে গণ্য হতে পারে যখন এগুলো সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সম্পন্ন করা হয়। আর কোন ইচ্ছাকে সদিচ্ছা প্রসূত হতে হলে সেই ইচ্ছাকে অবশ্যই বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত ও সমর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ এই বিষয়টিকে কান্ট দুইভাবে বুঝিয়েছেন-

প্রথমত – সদিচ্ছাই নিঃশর্তভাবে সৎ, সদিচ্ছা ভিন্ন আর সবকিছু শর্তাধীনভাবে ভাল। সম্পদ, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, চাতুর্য, জ্ঞান- এসব নিঃসন্দেহে ভালো যদি এবং কেবল যদি ঐসবের সঙ্গে সদিচ্ছা যুক্ত থাকে। কিন্তু সদিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সম্পদ, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি যদি অসদিচ্ছার দ্বারা চালিত হয় তাহলে তারা প্রত্যেকে অতন্ত মন্দ হতে পারে এবং জগতের কল্যাণ এর পরিবর্তে অকল্যাণের কারণ হতে পারে। আমরা সাধারণত সম্পদ, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, জ্ঞানকে ভালো বলে গ্রহণ করলেও কান্টের মতে তাদের ভালো সদিচ্ছার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তিনি বলেন এই জগতে এমনকি বাইরের জগতেও নিঃশর্ত ভালো আর কিছু নেই। সদিচ্ছাই কেবল নিঃশর্তভাবে সৎ, আর সবই শর্তযুক্তভাবে সৎ। “It is impossible to conceive anything at all in the world, or even out of it, which can be taken as good without qualification, except a good will.”¹²

¹² H. J. Paton, *Kant's Grundwork of the Metaphysic of Morals* (London: Hutchinson, 1948), 59.

দ্বিতীয়ত - সদিচ্ছা স্বতঃমূল্যবান অর্থাৎ নিজে নিজেই ভালো। সদিচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কিছু যুক্ত নাও থাকে, সদিচ্ছার সঙ্গে যদি প্রত্যাশিত ফলের যোগ সাধন নাও হয় তথাপি ঐ সদিচ্ছা ‘সদিচ্ছারূপেই’ থাকে। কান্ট বলেন, যদি শত চেষ্টাতেও সদিচ্ছা তার আশানুরূপ ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তথাপি ঐ সদিচ্ছা উজ্জ্বল রত্নের মতো স্বতঃমূল্যবান বস্তু রূপে আলোকিত থাকবে। স্পষ্টতই, কান্ট কর্মফলকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল কর্মনীতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভালো-মন্দ কর্মফলের ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে কর্তার সদিচ্ছার ওপর। এপ্রসঙ্গে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন মানুষের কর্ম যখন কেবল সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়, তখন তার ইচ্ছা স্বাধীন কেননা ঐ ইচ্ছা তার অন্ত্যঃসূত, বাহ্য-আরোপিত নয়। তাই সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন কর্মই হল নৈতিক কর্ম।

খ) **কর্তব্যই কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য** -ঃ কান্টের মতে নৈতিক কাজকে হতে হবে যুক্তিভিত্তিক বা নিয়মভিত্তিক। স্নেহ, দয়া, প্রেম ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে অনুষ্ঠিত কর্ম নৈতিক কর্ম নয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওইসব কাজকে ‘ভালো’ বলা গেলেও তাদের ‘নৈতিক ভালো’ বলা যাবে না। সমস্ত রকম আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদিকে সংযত রেখে বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনই হল নৈতিক কর্ম। “An action done from duty has its moral worth, not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to with which it is decided upon...”¹³। কান্টের মতানুসারে প্রত্যেক মানুষের

¹³ Paton, *Kant's Grundwork of the Metaphysic of Morals*, 65.

উচিত প্রত্যেকটি কাজ কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য হিসেবে সম্পন্ন করা। এরূপ কাজই ন্যায্য ও সৎ কাজ বলে গণ্য হবে।

গ) নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ –ঃ কান্ট নৈতিক নিয়মকে এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হিসেবে গণ্য করে বলেন যে, এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মটি আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বা বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতির ভিত্তিতেই কোন কাজের ভাল/ মন্দ নির্ধারিত হয়। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মানুসারে- এমন কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাকে একটি সার্বজনীন নিয়ম রূপে কামনা করা যেতে পারে। “Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law.”¹⁴। কান্ট এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মটি পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন-

অ) কান্টের মতে, প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তি, নিজেকে এবং অপরকে সর্বদা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, কখনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে নয়। “For all rational beings all stand under the law that each of them should treat himself and all others, never merely as a means, but always at the same time as an end in himself.”¹⁵। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মনুষ্যত্ব আছে। কোন ব্যক্তিই চায় না যে, তাকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হোক। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে কোন কাজের লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার

¹⁴ Paton, *Kant's Grundwork of the Metaphysic of Morals*, 84.

¹⁵ *Ibid.*, 95.

করা হলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কান্টের এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ যদি একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সহিত আচরণ করে তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আ) নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মটিকে যদি এবং কেবল যদি আমি স্বতঃআরোপিত বলে মনে করতে পারি তাহলেই ওই আদেশ পালনে আমি দায়বদ্ধ থাকবো। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নিয়মটি কান্টের মতে কোন ফললাভের কামনা-বাসনা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নিয়মটি আমাদের অন্তরে ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকে এবং সদিচ্ছা থেকে নির্গত হওয়ায় কাজেই নিয়মটি আমাদের ওপর বাহ্যআরোপিত নয়, তা অন্তঃসূত। অর্থাৎ আমরা নিজে থেকেই এই নিয়মটি পালনে প্রত্যেকে দায়বদ্ধ থাকি।

ই) কান্টের মতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজেকে উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্যের সদস্য হিসেবে মনে করে এমনভাবে কাজ করবে যেটাকে সে একটি নিয়মে পরিণত করতে পারবে। এবং যেটা তার স্ব-ইচ্ছাপ্রসূত। “A rational being must always regard himself as ends which is possible through freedom of the the will- whether it be as member or as head.”¹⁶ যেহেতু প্রত্যেক মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাই মানুষের সমাজ হল এক উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য যেখানে প্রত্যেকেই নিজেকে ও অপর ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এইপ্রকার উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্যে, সেইসব কাজকেই ‘ভাল’ বা ‘উচিত’ কাজ বলা হয়, যার দ্বারা ব্যক্তি কোন না কোনভাবে নিজের বা অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে। এবং যেখানে প্রত্যেকে স্বতঃমূল্যবান নাগরিকরূপে প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

¹⁶ Paton, *Kant's Grondwork of the Metaphysic of Morals*, 95.

করে। ফলে দারিদ্র, অশিক্ষা, অন্যায় আচরণ যথাসম্ভব সমাজ থেকে দূরীকরণ করে
সং ও সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং নৈতিকতা বিষয়ক কান্টের মতবাদ আলোচনা করে বলা যায় যে- তাঁর
মতে, কোন ব্যক্তিকে তখনই ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে যখন সে বিচারবুদ্ধির দ্বারা
পরিচালিত হয়ে শুধুমাত্র কর্তব্য সাধনের লক্ষ্যে কর্তব্য সম্পাদন করবে। এবং কোন
কাজকে তখনই ন্যায়কাজ বা ভালকাজ বলা যাবে যখন তা কোন সার্বিক নিয়মানুযায়ী
সম্পাদিত হবে এবং সেক্ষেত্রে কোন অসঙ্গতি দেখা দেবে না। তিনি এমন সমাজের
কথা বলেছেন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপায়রূপে না দেখে লক্ষ্যরূপে দেখা হয়,
যেখানে সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করে সকলের প্রতি সমান আচরণ
পালনের কথা বলা হয়। পূর্ববর্তী দার্শনিক অগাস্টাইন ও অ্যাকুইনাসের মতো ঈশ্বর
প্রেম বা বাহ্যিক কোন কারণের দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার না
করে, বরং কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে
বলেছেন। যে সমস্ত নৈতিক নিয়ম পালনের দ্বারা সমাজে সকল নাগরিক নিজে থেকেই
ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে এবং প্রত্যেকের প্রতি পারস্পারিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের
মাধ্যমে সমাজের সকলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌভাত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে
ব্যক্তি তথা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে।

৪) ন্যায়বিচার সম্পর্কিত জন রল্‌সের আলোচনা –ঃ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের

দশকের শুরুতে জন রল্‌স তাঁর ‘A Theory of Justice’ গ্রন্থে ন্যায়বিচারের ধারণাকে
এক নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেন। আমেরিকার বিশিষ্ট এই দার্শনিক ছিলেন
রাজনৈতিক দর্শনের নীতিগত চিন্তাধারার এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বে

সামাজিক-চুক্তি মতবাদ ও দার্শনিক কান্টের ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় আলোচনার প্রভাব যথেষ্ট লক্ষণীয়। কান্টের নৈতিক প্রেক্ষাপট বিচারে মানুষ নিজেই সকল নৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎসস্ফুল, কারণ সে নিজেই নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণের ও নির্বাচনের নৈতিক কর্তা। তিনি বলেন মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে তাই প্রত্যেকের উচিত নিজের এবং অপরের ওই মনুষ্যত্বকে লক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা, নিজের অথবা অপরের মনুষ্যত্বকে উপায়ে হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত কাজ। রল্‌সের মতানুসারে কান্টের এই প্রকার বক্তব্যের মধ্যেই নৈতিক সমতার ধারণাটি নিহিত রয়েছে। তার মতে সকল মানুষই নৈতিক দৃষ্টিতে সমান, তাই সকল মানুষ সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগের দাবিদার হওয়ার যোগ্য হয়। সমান সুযোগ লাভের ধারণাই সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত ধারণার মূলমন্ত্র। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অত্যাবশ্যিক। এবং এই কাজ নিছক পরস্পরের সম্মতি বা সমঝোতার দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। বরং এটি মানুষের পরস্পরের ঐক্যমতের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ প্রজ্ঞার আধিকারী, এই প্রজ্ঞার দ্বারা সে স্বাধীন ও পক্ষপাতহীনভাবে যাবতীয় কাজকর্ম স্বাধীনভাবে নির্বাচন ও সুসম্পন্ন করতে পারেন। মানুষের ওপর এই দায়িত্ব তার মর্যাদা ও মূল্যের কারণে বর্তায়। তবে মানুষের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায্য বলে পরিগণিত হতে পারে, এমন একটি প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে সামাজিক চুক্তি মতবাদ। মানুষ চুক্তির মাধ্যমে ন্যায়সম্পর্কিত ধারণাকে কার্যকর করে তোলে। রল্‌স যদিও দাবি করেন যে সকল মানুষ সমান কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, চুক্তিবদ্ধ সকল মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয় না। এমনকি কখনও কখনও সমাজের দুর্বল

ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রয়োজন ও অধিকার সমানভাবে বন্টন করতে পারে না। তাই রলস্ মনে করেন ন্যায়বিচারের মূল সমস্যা সৃষ্টি হয় ঐক্যমত হয়েছে কিনা তা নিয়ে নয়, বরং কোন অবস্থায় চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে সেটাকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেন, চুক্তির পরিবেশে সকল মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন চুক্তির পরিবেশ সমান থাকে। রলস্ এই চুক্তির পরিবেশ বা অবস্থাটিকে বলেছেন ‘The Original Position’। তাঁর এই Original Position এর ধারণায় সমতার অবস্থাকে নিশ্চিত করার জন্য বলেন যে, এক্ষেত্রে চুক্তিসম্পন্নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিগণ তাদের নিজের নিজের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। এবং ভবিষ্যতে তারা কোন অবস্থায় থাকবে ও কি প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাবে সে বিষয়ে কোন কিছু না জেনেই তাদের নীতিগুলি মেনে নিতে বলা হয়েছে। তাহলে এই ধারণায় যে নীতিই গ্রহণ করা হোক না কেন তা সকলের ক্ষেত্রেই ন্যায্য বলেই প্রতিপন্ন হবে, কারণ নিজেদের অবস্থান ও মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় সকলেই পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। (“..... The idea is to stipulate the features of this situation so that we can recognize that whatever principles would be chosen there would be just. Because we want the principles to be fair to all citizens, we want to force the parties in the choice situation to select only those principles that they believe could be justified to everyone. We do this by imagining them behind a ‘veil of ignorance’ that denies them knowledge of any identifying or specific information about themselves or their society. The idea is that since they do not know which social position or set of values they will turn out to hold when the veil of ignorance is lifted, they are forced to consider how the choice of principles would affect everyone. Rawls calls this purely hypothetical

choice situation' 'The original position' ”¹⁷। রলসের কাছে ন্যায় কোন প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন নয় অথবা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ন্যায় হল ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বণ্টন। তাঁর মতে, একটি সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও মূল্য থাকে যেগুলোর প্রত্যেকটি যথোচিত বা প্রশংসনীয় হলেও পারস্পারিক অসঙ্গতি বা বিরোধ দেখা দিতে পারে, ফলে সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় কী নীতি গ্রহণ করা যাবে? যাতে সমাজের প্রত্যেকের কাছে সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের মূল কাঠামো ধরে রাখা সম্ভব হবে। আবার এই সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য বণ্টনের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে প্রাথমিক বিষয়াদির বণ্টনকে সুনিশ্চিত করার মধ্যেই ন্যায়ের সমস্যা বর্তমান। প্রাথমিক সুবিধাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ, বিভিন্ন ক্ষমতা ও সুযোগ, আয়, সম্পদ ও আত্মরক্ষার উপায়সমূহ প্রভৃতি। এই বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক সুবিধাগুলি বণ্টনের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সংঘাত দেখা যায়। যেমন- কিছু ব্যক্তির আয় বৃদ্ধির জন্য অন্যান্যদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, অর্থাৎ সুযোগসুবিধার অসাম্য দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে অল্প আয়ের ব্যক্তিদের অসুবিধা হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে রলস ন্যায়ের দুটি নীতির কথা বলেছেন। এই দুটি নীতি হল-

প্রথম নীতি – সমাজের প্রত্যেকটি মানুষেরই অন্যান্য মানুষের অনুরূপ পর্যাপ্ত সমান স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে। “Each person is to have an equal right

¹⁷ Jon Mandle, *Rawls A Theory of Justice An Introduction* (New York: Cambridge University Press, 2009), 13.

to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others”¹⁸.

দ্বিতীয় নীতি –ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে -১) তা যুক্তিসঙ্গতভাবে সকলের সুবিধায় আসে এবং বিশেষত সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর ব্যক্তিবর্গের সুবিধায় আসে এবং ২) মর্যাদাপূর্ণ পদ ও অবস্থান লাভের সুযোগ সকলের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করতে হবে। “Social and Economic inequalities are to be arranged so that they are both 1) reasonable expected to be to everyone’s advantage, and 2) attached to position and office open to all”¹⁹।

ন্যায় সম্পর্কিত রলসের দুটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি দুটি নীতির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তা তিনটি নীতির সংমিশ্রণ। রলসের প্রথম নীতিটিতে বলা হয় যে, সকল মানুষেরই মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের সমান অধিকার আছে তাই মৌলিক অধিকারসমূহ ও চাহিদাগুলি সকলের মধ্যে সমানভায়ে বন্টন করতে হবে। আর দ্বিতীয় নীতিটির দুটি অংশ, প্রথম অংশটিকে বলা হয় বিভেদ নীতি কারণ এই নীতিটি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের উপকারে আসে। যেহেতু এই নীতির মাধ্যমে এটাই বলা হয় যে, সম্পদ ও মর্যাদা বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা একমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি এরূপ সমতার ফলে সমাজের অল্প সুবিধাভোগী, বঞ্চিত, নিপীড়িত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। এবং দ্বিতীয় নীতির দ্বিতীয় অংশে রলসের সমাজবাদী

¹⁸ Jhon Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1972), 60.

¹⁹ Ibid.

চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা বন্টনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উপযোগবাদীদের মতো সর্বাধিক ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধাকে গুরুত্ব না দিয়ে সমাজের সকল নাগরিকের মধ্যে ন্যায্য সুবিধা বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনি আসাম্য নীতি গ্রহণের কথাও বলেছেন। রল্‌সের আলোচনায় ন্যায় কোন প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন নয়, অথবা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ন্যায় বলতে বোঝায় ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বণ্টন অর্থাৎ ন্যায় হল সুবিচার করার ন্যায্যতা।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের
আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের আলোচনা

মনুসংহিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা -ঃ

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে ‘মনুসংহিতা’ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। মনুসংহিতার অন্তর্গত দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে ভারতীয়দের সামাজিক, নৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বলতে গেলে একটা সমাজব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মনুসংহিতার বিষয়বস্তু নানা ধারায় বিস্তারিত হয়েছে। বৈদিক ভাবনা ও আদর্শকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে বলে প্রচার করা হলেও যে সময়ে এই গ্রন্থের সৃষ্টি সে সময়ের সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখেও এই গ্রন্থে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। মনুসংহিতার আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্লোকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে -

“ আস্মিন্ ধর্মোহখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্মণাম্ ।

চতুর্গামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাস্ততঃ ।। ”¹

অর্থাৎ এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হল - যা কিছু ধর্ম নামে অভিহিত হতে পারে তা-ই এই শাস্ত্রে সমগ্রভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মবিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য এই শাস্ত্র ই যথেষ্ট, অন্য কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। “ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে, শ্লোকে উল্লিখিত ‘ধর্ম’ পদটির দ্বারা সমস্ত প্রকার কর্মের উল্লেখ

¹ ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুঃ এবং সম্পাঃ), মনুসংহিতা (কলকাতা: সদেশ, ১৪১২), ৪৩।

হয়েছে”²। আবার এই সমস্ত কর্মসমূহের দোষ , গুণ ইত্যাদিও এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্বর্গের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির পালনীয় কর্তব্যসমূহ এককথায় সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির পালনীয় কর্তব্য, বিধি- নিষেধাজ্ঞা ও আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী মনুসংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে ‘ধর্ম’ শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, লৌকিক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়নি। সাধারণভাবে ধর্ম বলতে বোঝায় ঈশ্বর আরাধনা, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে ‘ধর্ম’ বলতে বোঝায় - শাস্ত্রসম্মত সামাজিক আচরণবিধি যা প্রত্যেক মানুষের তার বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সমাজে বসবাস করে নিজের এবং অপরের কল্যাণের জন্য মানুষকে যেসব আচরণবিধি অনুসরণ করতে হয়, সেটাই তার ধর্ম। অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কর্মসাধনই মানুষের ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় ধর্ম ও নীতি শব্দদুটি বিশ্লিষ্টভাবে নেই, তা কখনো হয়েছে ধর্মভিত্তিক নীতি, আবার কখনো হয়েছে নীতিভিত্তিক ধর্ম। ভারতীয় দর্শনে যে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ করা হয়েছে ‘ধর্ম’ হল তাদের মধ্যে অন্যতম একটি পুরুষার্থ। মনুসংহিতাতেও ধর্ম বলতে কর্তব্যকর্মকেই বোঝান হয়।

১। মনু উল্লিখিত কর্তব্যকর্ম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আলোচনা -ঃ

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনু উল্লিখিত নীতি-বিধানের মধ্যে আমরা আদর্শ সমাজব্যবস্থার রূপ খুঁজে পাই। সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য তিনি সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কর্তব্যকর্ম পালনের কথা

² বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, ৪৪।

বলেছেন। কর্তব্যকর্ম বলতে বোঝায় যে কাজ করা অবশ্য পালনীয়। মনু দুইপ্রকার কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করেছেন- ক) সাধারণ কর্তব্যকর্ম (সাধারণধর্ম) খ) আপেক্ষিক কর্তব্যকর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম)। “Manu’s classification of the duties is one of the earliest attempts at a systematic treatment of this subject. Manu distinguishes between common duties(sádháranadharmas), i.e., duties of universal scope and validity, and relative duties(varnáshramadharmas), i.e., duties relative to one’s station in life.”³

ক) সাধারণ কর্তব্যকর্ম (সাধারণ ধর্ম) –ঃ সাধারণ ধর্ম হল বর্ণ ও আশ্রম নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য আবশ্যিক ধর্ম বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম। সাধারণ ধর্ম বর্ণাশ্রম ধর্মের মতো সমাজসম্মত ধর্ম হলেও এই ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই, এইধর্ম সব মানুষের জন্য সাধারণভাবে পালনীয় ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম। সমাজে বসবাস করে প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের প্রতি এবং সমাজের অপরাপর ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য থাকে। সেইসব কর্মই হলো সাধারণ ধর্ম বা অবশ্য কর্তব্যকর্ম। এইসব কর্ম ‘যদি তাহলে’ শর্তযুক্ত সাপেক্ষ বিশেষ কর্ম নয়, তা হল জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য পালনীয় ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম। প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রত্যেক মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক সুরক্ষা এবং সাহায্য পাওয়ার জন্য কিছু প্রতিদান দিতে দায়বদ্ধ থাকে, এই দায়বদ্ধতাই হলো সাধারণ ধর্মের বা সাধারণভাবে অবশ্য কর্তব্যকর্মের নিহিতার্থ। “Under the class of the

³ Sushil Kumar Mitra, *The Ethics of Hindus* (Kolkata : Calcutta University Press, 1925), 8.

sádháranadharmas or common duties, Manu enumerates the following ten:-

1) Steadfastness (Dhairya), 2) Forgiveness (kshamá), 3) Application (dama), 4) Non-appropriation, i.e., Avoidance of theft (chouryábháva), 5) Cleanliness (shoucha), 6) Repression of the sensibilities and Sensuous appetites (Indria-nigraha), 7) Wisdom (Dhi), 8) Learning (Vidyá), 9) Veracity (Satya), 10) Restraint of Anger (Akrodha)."⁴ ।

মহর্ষি মনু এমন দশটি সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করেছেন যা বর্ণ ও আশ্রম নির্বিশেষে সব মানুষের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। যথা-

১) ধৃতি বা স্থিরসংকল্পসহ কর্মসাধন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কর্তব্য পালন করা যায় না। নিজ সমাজের এবং বিশ্ব সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে তাই প্রত্যেককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

২) ক্ষমা বা মার্জনা। অপরের দোষ মার্জনা করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে। দোষ মার্জনায় অন্তর শুদ্ধ হয়, মনের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। মনে বিদ্বেষ থাকলে অপরের কল্যাণ সাধন সম্ভব হয় না।

৩) দম বা মনঃসংযোগ। বিষয়ে মনোনিবেশ করা না গেলে কোন কর্মই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

৪) চৌর্যাভাব অর্থাৎ পরদ্রব্য অপহরণের চিন্তাকে পরিত্যাগ করে নিজের উপার্জিত অর্থে জীবন যাপন করতে হবে।

⁴ Mitra, *The Ethics of Hindus*, 9.

৫) শৌচ বা শুচিতা বলতে বোঝায় দেহ এবং মনকে শুদ্ধ রাখা। অশুদ্ধ দেহে এবং অপবিত্র মনে কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়-আসক্তি দমন। মানুষকে পশুর উর্ধ্বে উন্নীত করতে হলে আত্মগত ইন্দ্রিয়সুখকে যথাসম্ভব দমন করতে হবে, অপরের সুখ কামনা করতে হলে আত্মগত ইন্দ্রিয়সুখ কিছুটা পরিত্যাগ করতে হবে।

৭) ধী বা জ্ঞান। কর্মের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত না করলে সেই কর্ম সমাজকল্যাণমূলক কর্ম হতে পারে না। তাই জ্ঞানের প্রয়োজন।

৪) বিদ্যা বা অধ্যয়ন বলতে বোঝায় শিক্ষা অথবা চর্চার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান অর্থাৎ পাণ্ডিত্য। কল্যাণকর্মের একটি পূর্বশর্ত হলো কর্মকর্তার পাণ্ডিত্য - কর্ম ও অকর্ম সম্পর্কে, কর্মসাধনের পথ সম্পর্কে এবং কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই হলো কর্মপাণ্ডিত্য।

৯) সত্য বা সত্যবাদিতা। সত্যকথা বলা হল কল্যাণকর্মের একটি পূর্বশর্ত, এবং

১০) অক্রোধ বা ক্রোধ বর্জন। উগ্র আবেগ ক্রোধকে দমন করা না গেলে কোন কল্যাণকর্ম সাধন সম্ভব হতে পারে না।

এইসব সাধারণ ধর্মগুলি সব বর্ণের এবং সবপর্যায়ের বা আশ্রমের অন্তর্গত সব মানুষের জন্য পালনীয় কর্ম। বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের একটি পূর্বশর্ত হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই বিশেষ ধর্মগুলি পালন করতে হয়। ব্রাহ্মণ তার বিশেষ বর্ণধর্ম (ব্রাহ্মণধর্ম) অনুসারে কর্ম করলেও, সাধারণধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য শূদ্রের স্বার্থকেও অবজ্ঞা করেন না। শূদ্রের দিনযাপন যাতে ভালোভাবে হয় সেজন্য

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে “প্রকল্প্যা তস্য তৈব্ৰিত্তিঃ স্কুটুম্বাদ্ যথার্থতঃ। শক্তিধগবেক্ষ্য দাক্ষ্যধঃ ভৃত্যানাধঃ পরিগ্রহম্।।”⁵। অর্থাৎ শূদ্রের কার্যনৈপুণ্য ও পরিবার পরিজনের সংখ্যা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তার বেতন ব্যবস্থা সঠিকভাবে করা উচিত। এইদিক থেকে বলা যায় যে, মনু উল্লিখিত সমাজে বর্ণবিভাগের উল্লেখ থাকলেও ব্যক্তির মানবিক দিকটিকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হয়নি। চতুর্বর্ণের অন্তর্গত শূদ্রবর্ণ সর্বনিম্ন বর্ণ হলেও মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি। সুতরাং বলা যায় যে, বর্ণধর্মের পূর্বশর্তরূপে সাধারণ ধর্ম পালিত হওয়ায় এক্ষেত্রে সমাজের সকল ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে।

খ) আপেক্ষিক কর্তব্যকর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম) –ঃ মনুর প্রকল্পিত সমাজের প্রধান ভিত্তি ছিল বর্ণ ও আশ্রম। বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মানুষের যে কর্তব্যকর্ম তাই হল শর্তাধীন বিশেষ ধর্ম। এই ধর্ম সব মানুষের জন্য নির্ধারিত সাধারণ ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম নয়, তা হল বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মানুষের জন্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম বা বিশেষধর্ম। বর্ণধর্ম হল ব্যক্তির বর্ণ অনুসারে – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ অনুসারে সমাজস্থ ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম। এক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির প্রতি- সব বর্ণের ও সব আশ্রমভুক্ত মানুষের প্রতি কর্তব্যসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ বর্ণাশ্রমের মানুষের প্রতি বিশেষ কর্তব্যসমূহ বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় এই ধর্মকে বিশেষধর্ম বলা হয়। বর্ণধর্ম অনুসারে -

১) কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্মগুলি হল -

⁵ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদ), মনুসংহিতা (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩), শ্লোক - ১০/১২৪, ৪২৮।

পতিগ্রহ- এক্ষেত্রে বলা হয় যে, নিস্বার্থভাবে অপর কোন ব্যক্তি যদি কিছু দান করে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ করতে পারবে।

অধ্যাপনা - অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হিসেবে অধ্যয়ন, জ্ঞানবিতরণ করার মাধ্যমে জনগণের কল্যান সাধন করাই হল তাঁর প্রধান ধর্ম।

যজন-পূজন - ইষ্ট ফললাভ ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞ ও পূজার্চনা করার অধিকার ও দায়িত্ব একমাত্র ব্রাহ্মণরাই লাভ করে। সুতরাং এই যাগযজ্ঞ ও পূজার্চনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাই হল ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম।

২) কেবল ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্য কর্তব্যকর্মগুলি হল -

প্রজাপালন- ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাজ হল সমাজের আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় থেকে ও বহিঃশত্রুর অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা।

অসাধুনিগ্রহ- দুর্জনদের দমন করা।

যুদ্ধে অ-নিবর্তন- যুদ্ধ করতে গিয়ে কাপুরুষতা বশত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা ইত্যাদি।

৩) কেবল বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্য কর্তব্যকর্মগুলি হল -

ক্রয়-বিক্রয় - যথামূল্য প্রদান করে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা ও যথামূল্যে পণ্যদ্রব্য অপরকে বিক্রয় করা।

এছাড়া ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে কৃষিকার্য অর্থাৎ ভূমি চাষ করা, এবং গো-মহিষাদি উৎপাদন, তাদের লালন ও পরিচর্যা করা ইত্যাদি।

৪) কেবল শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্য কর্তব্যকর্ম হল -

পূর্ববর্ণ-পারতন্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করাই হল শূদ্রের কর্তব্যকর্ম।

বর্ণধর্মে যেমন বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে, তেমনি আবার আশ্রম ধর্ম অনুসারেও ব্যক্তির ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য বর্ণধর্মের মতো আশ্রম ধর্মও বিশেষ ধর্ম, সাধারণ ধর্ম নয়। আশ্রম ধর্ম হল ব্যক্তির আশ্রম অনুসারে- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার পর্যায় অনুসারে সমাজস্থ ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম। যেমন-

ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করে গুরুর পরিচর্যা করা, অধ্যয়ন করা, ও পরবর্তী পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য অর্থ উপযোগী শিক্ষা লাভ করাই হল আশ্রমবাসী শিষ্যের ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম।

গার্হস্থ্য আশ্রমে বিবাহিত জীবনে সংযত কামনা চরিতার্থ করে এবং সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করাই হলো গৃহীর ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম।

বাণপ্রস্থ আশ্রমে সংসারে বসবাস করে ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিরাসক্ত জীবন যাপন করাই হলো আশ্রমবাসীর কর্তব্যকর্ম বা ধর্ম।

সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তির ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম হল - অর্থ, বিত্ত, ও সংসারধর্মের প্রতি সম্পূর্ণভাবে কামনা পরিত্যাগপূর্বক অন্তরের মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই হল সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম।

সুতরাং বলা যায় যে, মনু উল্লিখিত এই দুই প্রকার ধর্মের উদ্দেশ্য হল সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজের আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখা, যার দ্বারা সমাজের সকল শ্রেণী ও সকল নাগরিকের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হবে।

২) মনু'র আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যায়বিচারের আলোচনা -৪

মনু উল্লিখিত সমাজের চারপ্রকার বর্ণব্যবস্থা, আশ্রমব্যবস্থা, রাজধর্ম, নারীর অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে মনুর সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের ধারণা পাওয়া যাবে।

বর্ণব্যবস্থা - মনুসংহিতায় চার বর্ণের মানুষের বিশেষ বিশেষ কর্মের ও গুণের বিস্তৃত নির্দেশ পাওয়া যায়। 'বর্ণ' বলতে এখন আমরা জাতি বুঝি কিন্তু বর্ণের মূল অর্থ হল 'রঙ'। “ পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে- 'ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং চ লোহিতঃ। বৈশ্যাণাং পীতকশ্চৈব শূদ্রাণামসিত স্তথা।।”⁶। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারপ্রকার মানুষের প্রত্যেকের সুক্ষ্ম শরীরের বর্ণ (রঙ) আলাদা আলাদা হওয়ায়, যেমন- ব্রাহ্মণের বর্ণ সাদা, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত, ও শূদ্রের কালো- সেই অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কর্মব্যবস্থা নির্ধারণই হল বর্ণব্যবস্থার মূল আলোচ্য বিষয়। আবার শূক্রনীতিতে বলা হয়েছে –“ ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যে এব বা । ন শূদ্র ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম ভিঃ।।”⁷। অর্থাৎ জাতি বা জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ধারিত হয় না, গুণকর্ম দ্বারাই এদের প্রভেদ নির্ধারিত হয়। তবে পরবর্তীকালে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে কোন এক সময় থেকে জন্মকেই জাতিভেদের নির্ধারকরূপে করা হয়। মনুও জন্মকেই জাতিভেদের নির্ণায়ক মনে করলেও গুণ ও কর্মের দ্বারাই যে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ধারিত হয় তা বারবার বলেছেন।

⁶ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, ২।

⁷ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, ১৫।

মনুর মতে চারটি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। তবে এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা বিদ্বান তারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম ও ব্রহ্মত্ব ভেদে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতার কথা বলা হলেও, তাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনার অধিকার থাকলেও ব্রাহ্মণ যদি আচার ভ্রষ্ট হন তবে তিনি বেদ-বিহিত ক্রিয়া-কলাপের ফললাভ করতে পারেন না। “আচারাচ্ছিত্যো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে। আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥”^৪। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের জীবিকা নির্বাহের উপায় বিষয়ে জ্ঞান রাখবেন এবং বৃত্তি সম্বন্ধে যেসব নিয়ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে নিজেও তা পালন করবেন। ব্রাহ্মণের একটি অবশ্য কর্তব্য হলো সমাজের সকলের মঙ্গল সাধন করা। কারণ সমাজে বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না বলে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে সমাজের লোকের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মঙ্গল সাধনে প্রয়াসী হতেন। তিনি অন্য কিছু যজ্ঞ করণ বা না করণ জপ কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। যজ্ঞে পশুহত্যার মতো হিংসা থাকায় তা সকলের প্রিয় হয় না, কিন্তু জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ হিংসাশূন্য হওয়ায় তিনি সকলের, এমনকি শূদ্রেরও প্রিয় হয়ে ব্রহ্মলাভের যোগ্য হন, এইজন্য এইরকম ব্রাহ্মণকে মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণের আরেকটি অবশ্য কর্তব্য হলো ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করার চেষ্টা করা। মনুর মতে, “ একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্রে চ ভোজোয়েৎ”^৯। অর্থাৎ একজন বেদ বিষয়ে বিদ্বান ব্রাহ্মণকে যদি দৈবিককাজে ও পিতৃকাজে ভোজন করানো

^৪ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, শ্লোক- ১/১০৯, ১৮।

^৯ তদেব, শ্লোক - ৩/১২৯, ৯৪।

যায়, তা হলেও পূণ্যলাভ হয়। দশ লক্ষ ব্রাহ্মণের থেকে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজে পূজনীয়।

ক্ষত্রিয়ের কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনু প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন “ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।।”¹⁰। অর্থাৎ প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং ভোগবিলাসে নিযুক্ত না থাকা - এই কাজগুলি ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট তবে এগুলির মধ্যে প্রজাপালনই হল শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের যেমন দায়িত্ব তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা সমাজের উপকার করা। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রেও সেইরকম যে, তাদের শারীরিক শক্তির দ্বারা দেশ ও দেশের জনগণকে সমস্ত প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হল তাঁদের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্রে যুক্ত না হলে আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব হয় না। ক্ষত্রিয় বা রক্ষকসংঘের মধ্যে সকলের শীর্ষে হলেন রাজা। রাজার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে মনু বলেন যে - “ কৃৎস্নং চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ। অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মন্ডলস্য চ।।”¹¹। রাজা পাঁচ রকমের গুণ্ডচর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখবেন, সমগ্র দ্বাদশ রাজমন্ডলের গতিবিধি সম্পর্কেও রাজাকে সম্যকভাবে জানতে হবে এবং আটপ্রকার কর্ম যাতে সমাজে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সে বিষয়েও রাজা লক্ষ্য রাখবেন। এই আটপ্রকার কর্ম হল- ১) আদান - রাজস্ব বিষয়ক কর বা খাজনা ইত্যাদি আদায় করা। ২) বিসর্গ - ভৃত্য, অভাবী ব্যক্তিদেরকে ধনদান করাকে বোঝায়।

¹⁰ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, শ্লোক -১/৮৯, ১৫।

¹¹ তদেব, ২৫৩।

৩) প্রৈষ - দুষ্ট ব্যক্তিকে ত্যাগ করা।

৪) নিষেধ - যাদের উপর ধনরক্ষার ভার দেওয়া আছে, তাদের বেশী খরচ করার প্রবৃত্তিকে বাধা দান করা।

৫) অনুবচন - যে কোন ব্যক্তিকে অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত হতে বাধাদান করাকে বোঝায়।

৬) ব্যবহারেক্ষণ - চার বর্ণের বা চার আশ্রমের মধ্যে কর্মব্যবস্থা বিষয়ে সংশয় বা বিবাদের সৃষ্টি হলে তার সমাধান করতে হবে।

৭) দণ্ড - বিচারালয়ে পরাজিত পক্ষের উপর উপযুক্ত দণ্ড ধার্য করাকে বোঝায়।

৪) শুদ্ধি - প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য শুদ্ধি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আটপ্রকার কর্মই হল রাজার কর্তব্যকর্ম।

মনুসংহিতায় সঠিক বিচারব্যবস্থা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচারক হিসেবে রাজার কর্তব্য হল সঠিক বিচার করা। বিচারব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন- “ অদগ্ণান দণ্ডয়ন্ রাজা দগ্ণ্যাংশ্চৈবাণ্য দণ্ডয়ন্। অযশো মহাদাপ্নোতি নরাবান্ধৈব গচ্ছতি। ”¹²। অর্থাৎ বিচারের ফলাফল যদি এমন হয় যে, যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় নয় তাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে আর যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় তাকে দণ্ড দেওয়া হয়নি, তবে তার শাস্তি রাজাকেও ভোগ করতে হবে। রাজা শাস্তিস্বরূপ নরকে পতিত হবে। রাজার প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেন -“কামক্রোধৌ তু সংযম যোহর্থান্ ধর্ম্মেণ পশ্যতি।

¹² তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, শ্লোক - ৮/১২৮, ২১৩।

প্রজাস্তম্ভনুবর্তন্তে সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।।”¹³। অর্থাৎ যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ সংযম করে ধর্মসম্মত উপায়ে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকেন তিনিই প্রকৃত শাসক বলে গণ্য হবে। রাজা যদি এরূপ না হন তাহলে প্রজাবর্গ তাঁকে মানতে বাধ্য থাকবে না।

মনু বৈশ্যদের জন্য পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্যবৃত্তি, ধনবৃদ্ধির জন্য ঋণদান এবং কৃষিকর্ম - এই কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বলেছেন। “পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিকপথং কুসাদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব”¹⁴। বৈশ্যদের মনি, মুক্তা, প্রবাল, তৈজসদ্রব্য, এবং নানা প্রকার দ্রব্যের মূল্য ও ভালো-মন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হত। তারা বীজ বপন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন হতেন। এছাড়াও পণ্যদ্রব্যের দীর্ঘকাল বা অল্পকাল স্থায়িত্ব, বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিদের ভাষা এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বৈশ্যদেরকে বিশেষভাবে অবহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, বৈশ্যগণ ধর্মসম্মত উপায়ে ধনবৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে যত্নবান থাকতেন।

সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ করে মনুসংহিতায় শূদ্র জাতি একটি বিতর্কিত স্থান অবলম্বন করে আছে। মনুর মতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য - এই তিন বর্ণের মানুষদের পরিচর্যা করাই হল শূদ্রের প্রধান কর্তব্য। “একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশং। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রুশামনসূয়য়া।।”¹⁵। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, শূদ্র যদি নিজে কোন ভাল কাজ করে, এবং কোন ব্রহ্মচারীকে সেরকম করতে উপদেশ দেয় তবে অন্যদেরও তার সহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আচরণ করা উচিত। এছাড়াও ব্রাহ্মণদের

¹³ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা শ্লোক - ৮/১৭৫, ২১৮।

¹⁴ তদেব, শ্লোক - ১/৯০, ১৫।

¹⁵ তদেব, শ্লোক - ১/৯১, ১৫।

উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, শূদ্রের দিনযাপন যাতে ভালোভাবে হয় সেজন্য তার কার্যনিপুণ্য ও পরিবার পরিজনের সংখ্যা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তার বেতন ব্যবস্থা সঠিকভাবে করা উচিত। “প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্কুটুম্বাদ্ যথার্থতঃ। শক্তিধগবেক্ষ্য দাক্ষ্যধঃ ভৃত্যানাধঃ পরিগ্রহম্ ।।”¹⁶।

সুতরাং মনুর সমাজব্যবস্থা আলোচনা করে বলা যায় যে, তিনি সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বর্ণবিভাজনের ব্যবস্থা করলেও প্রত্যেকটি বর্ণের ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এর চার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের মর্যাদা শ্রেষ্ঠ হলেও ব্রাহ্মণ যদি তার আচরণ সম্পর্কে যথা সচেতন না হন তবে সেই ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজাও যদি তার কর্তব্য সম্পর্কে যথা সচেতন না হন তবে সেই রাজাকে প্রজাবর্গ মানতে বাধ্য থাকবে না। মনু যদিও শূদ্রকে সর্বনিম্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তথাপি তাঁর মতে শূদ্র যদি পবিত্র ও উচ্চবর্ণের প্রতি অনুগত হয়, এবং মৃদুভাষী, নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণের প্রতি সর্বদা বিনীত থাকে তবে পরজন্মে সে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করতে পারে। “শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রুমৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ। ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নতে।।”¹⁷। সুতরাং, এরূপ অভিমত থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য যা যা করণীয় তা যথাসম্মতভাবে পালনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক মঙ্গলের কথা বলেছেন। এবং এই কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তিনি

¹⁶ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, শ্লোক - ১০/১২৪, ৪২৮।

¹⁷ তদেব, শ্লোক - ৮/২৮, ২৭৮।

বিশেষধর্ম ও সাধারণধর্মের উল্লেখ করে সমাজের একটা নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছেন। সর্বোপরি মনু নারীদের প্রতি যাতে অন্যায় আচরণ না হয় তার জন্যও বলেন যে, “বশাহপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ । পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ ॥”¹⁸। অর্থাৎ যদি কোন নারীকে সুরক্ষা দেবার জন্য পুত্র বা কোন পুরুষ পরিবার না থাকে, অথবা যদি সে বিধবা থাকে তাহলে রাজা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন এবং যদি ঐ নারীর সম্পত্তি কোন বন্ধু, আত্মীয় বা অপর কোন ব্যক্তি হরণ করে তবে রাজা দোষীদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। নারীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন- যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেই সমাজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন সবই নিষ্ফলে যায়। “যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥”¹⁹। মনুর এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে নারীজাতির প্রতি যাতে অন্যায় আচরণ না হয় সেদিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সে কথা আমরা মনুসংহিতার মাধ্যমে বহু প্রাচীন যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করি, এবং সমাজে অন্যায় আচরণ যাতে না হয় তার জন্য তিনি যথাযোগ্য বিধানের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থার কথাও বলেছেন। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মনুসংহিতায় আমরা লক্ষ্য করি যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী থাকলেও তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

¹⁸ তর্করত্ন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, শ্লোক - ৩/৬০, ৮৫।

¹⁹ তদেব, শ্লোক - ৩/৫৬, ৮১।

এছাড়াও মনু কথিত সাধারণ ধর্মের কর্তব্যসমূহ সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় সমাজের সকলের প্রতি একটা সমআচরণের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, এবং বর্ণব্যবস্থা থাকলেও শূদ্রের প্রতিও যাতে অন্যায় আচরণ না হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আবার রাজা যদি তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করে, যদি অন্যায় আচরণ করে তবে তিনি একথাও বলেন যে সেই রাজাকে প্রজাবর্গ মানতে বাধ্য থাকবে না এবং অপরাধীকে যথার্থ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রতি সম্মান, ও ন্যায়বিচার প্রদর্শনের দ্বারা তিনি একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

৩) প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের গুরুত্ব-ঃ

বেদপরবর্তী প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হলো একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মূলত রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিষয়ক হলেও গ্রন্থটিকে অর্থশাস্ত্র নামেই অভিহিত করা হয়। এবং প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনাকে সাধারণতঃ দণ্ডনীতি, রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে রাজ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি রচনা করেন। সামাজিক ভাবনাবোধ ও মৌর্য রাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া প্রজাদের অর্থনৈতিক কল্যান, ক্রেতা সুরক্ষা ব্যবস্থা, সম্পদের বন্টনে ন্যায্যতা নীতি অনুসরণ ইত্যাদি আলোচনা অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটিকে এক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা

দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং প্রশাসন সম্পর্কে কোনরকম মূল্যায়ন ফলপ্রসূ হবে না, যদি না কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রের’ যথাযথ পর্যালোচনা করা হয়। গ্রন্থটির ‘অর্থ’ শব্দটির দ্বারা ‘সম্পদকে’ বোঝানো হয়নি, এক্ষেত্রে ‘অর্থ’ শব্দটির দ্বারা তিনি সম্পদ ও সম্পদের উপযোগী মানুষের আধার যে পৃথিবী তাকেই বোঝানো হয়েছে। এবং সেই পৃথিবীর পালন ও রক্ষণ বিষয়ক যে শাস্ত্র তাই হল অর্থশাস্ত্র। “মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ, মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ পৃথিব্যা লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি।”²⁰। সমগ্র অর্থশাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়বস্তুকে পনেরোটি অধিকরণে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই ‘বিদ্যাসমুদ্যেশ’ নামক অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যা চারপ্রকারের- যথা- আত্মশিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, এবং দণ্ডনীতি। “আত্মশিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ড নীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ। চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভির্ধর্মার্থৌ যদ্বিদ্যাভুদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্।”²¹। আত্মশিক্ষিকীবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের উপায়তুল্য, ও সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ত্রয়ী বলতে তিনি সামবেদ, ঋগ্বেদ, ও যজুর্বেদ – এই তিনটি বিদ্যাকে একত্রে বুঝিয়েছেন। কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতীয় সমাজের আদর্শ অনুযায়ী চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম প্রথাকেও তিনি সমর্থন করেছেন। ত্রয়ীতে চারবর্ণ ও চার আশ্রমের নিজ নিজ পালনীয় ধর্মসমূহের উল্লেখ থাকায় বিদ্যা হিসেবে ত্রয়ীর গুরুত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারবর্ণে

²⁰ মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়(সম্পাদ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৩), অধিকরণ-১৫, আধ্যায়-১, ৬৬২।

²¹ তদেব, অধিকরণ-১, আধ্যায়-২, ৭৪।

বিভক্ত ছিল। এবং এই চারবর্ণের আচার-আচরণ, ও কাজ-কর্মও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন- ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন- অধ্যাপনা, যজন-যাজন ইত্যাদি; ক্ষত্রিয়ের প্রজা রক্ষাকর্ম; বৈশ্যের বাণিজ্য কর্ম ও কৃষিকার্য, পশুপালনব্যবস্থা; এবং শূদ্রের উচ্চবর্ণের সেবা-যত্ন ইত্যাদি – এইভাবে প্রত্যেক বর্ণের জন্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ ত্রয়ী বিদ্যাতে অন্তর্গত হয়েছে, ফলে সমাজস্থ সকল ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিতভাবে ও সুসামঞ্জস্যভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। আবার সকল বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জীবনও – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস- এই চার আশ্রমে বিভক্ত, এবং সেই আশ্রমসমূহের পালনীয় কর্তব্যসমূহও ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি ত্রয়ী বিদ্যার প্রশংসায় বলেন “ত্রয়্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি।।”²²। অর্থাৎ যে সমাজ ত্রয়ীর বিধান দ্বারা রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে এবং সেই সমাজ কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। সমাজের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সকলে যাতে নিজ নিজ কর্তব্যসমূহ পালনের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য তিনিও বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম পালনের কথাও স্বীকার করেছেন। এছাড়াও সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের ব্যক্তিদের জন্য পালনীয় যে স্বধর্ম – তা যথাযথভাবে পালন করার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন স্বধর্ম যথাযথভাবে পালিত হলে স্বর্গপ্রাপ্তিজনিত অনন্ত সুখলাভ সম্ভব হয়। আর যদি স্বধর্মের পালনে লঙ্ঘন ঘটে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে ও সমাজ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হবে। এবং সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গ যাতে স্বধর্ম পালনে রত থাকে সে বিষয়ে তিনি শাসক বা রাজাকে লক্ষ্য বা নজর রাখার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যে রাজা প্রজাগণকে

²² বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৩, শ্লোক- ৪, ৭৮।

স্বধর্ম আচরণ করাতে পারেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হতে পারেন।
“তস্মাৎ স্বধর্মং ভূতানাং রাজা ব্যভিচারয়েত্। স্বধর্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ
নন্দতি।। ব্যবস্থিতার্যমর্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।”²³।

আস্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ছাড়াও কৌটিল্য বিদ্যারূপে বার্তা ও দণ্ডনীতির উপর গুরুত্ব
আরোপ করেছেন। কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্য- এই তিনটি বার্তা বিদ্যার প্রতিপাদ্য
বিষয়। এই বিদ্যা অত্যন্ত উপকারী, কারণ এর দ্বারা জীবিকা অর্জন করা যায় ফলে
রাজকোষ সমৃদ্ধি লাভ করে। যার ফলে শাসক জনগণের কল্যাণমূলক কাজ করতে
পারে, সৈন্যরক্ষা করে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য ও প্রজাবর্গদের রক্ষা
করতে সক্ষম হয়। সুতরাং রাজার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যপালনের জন্য রাজকোষাগারের
সমৃদ্ধি অত্যাবশ্যিকীয়, যা বার্তা বিদ্যার অন্তর্গত বিষয় হওয়ায় কৌটিল্য এই বিদ্যার
প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন।

আর যে শাস্ত্র দণ্ডনীতির বিষয় পর্যালোচনা করে তাকে দণ্ডনীতি বা শাসননীতি
বলা হয়। মূলতঃ কৌটিল্যের মতে, দণ্ডনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগেই রাজ্যবৃদ্ধি, রাজ্যরক্ষা,
এবং রাজ্যোন্নতি সম্ভব হয়। তাঁর মতে, “ অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি।
বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে। স তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি।।”²⁴। অর্থাৎ রাজা যদি
রাজ্যে তাঁর শাসন জারি না রাখে তাহলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, দণ্ডের অভাবে
বলবান ব্যক্তি দুর্বলের উপর অন্যায় আচরণ করবে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যথাযথ সম্মান
পাবে না, এবং প্রত্যেকে নিজ কর্তব্যে অবহেলা করবে ফলে রাজ্য তথা সমাজে এক

²³ বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৩, শ্লোক- ৩, ৭৮।

²⁴ তদেব, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮১।

বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে কৌটিল্যের মতে, এই দণ্ড যথার্থভাবে প্রয়োগ করে হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন -“ তীক্ষ্ণদণ্ডো হি ভূতানামুদ্বৈজনীয়ঃ। মৃদুদণ্ডঃ পরিভূয়তে। যথার্থদণ্ডঃ পূজ্যতে। সুবিজ্ঞাতপ্রণীতো হি দণ্ডঃ প্রজা ধর্মার্থকামৈর্যোজয়তি।”²⁵। অর্থাৎ রাজা যদি প্রজাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহলে প্রজার রাগের পাত্র হয়ে যাবেন। আবার যদি স্বল্প দণ্ড ধার্য করেন তবে তা যথার্থভাবে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে তাই রাজার উচিত বিবেচনার সহিত যথার্থভাবে দণ্ড প্রয়োগ করা। অর্থাৎ যে যেমন দণ্ড পাওয়ার যোগ্য তার প্রতি সেরকম দণ্ডের বিধান দিতে হবে। বিবেচনার সহিত দণ্ড প্রয়োগ করলে প্রজাবর্গ ধর্মপরায়ণ হয় এবং নিজ নিজ কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে।

৪) অর্থশাস্ত্র আলোচনার প্রেক্ষিতে কৌটিল্যের মতে ন্যায়বিচারের

ধারণা -ঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীভূত ও স্বেচ্ছাচারী প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি প্রজাহিতৈষীমূলক কাজকর্ম ও রাজ্যের শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উপরিউক্ত চার প্রকার বিদ্যা ছাড়াও কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে

²⁵ বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮১।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজার চরিত্র ও প্রজাবর্গের সহিত তার আচরণ, বিনিময়মূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন।

কর্তৃত্ব, আনুগত্য, শৃঙ্খলা এবং দণ্ডনীতি হল কৌটিল্যের প্রশাসনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নীতি। তাঁর মতে, রাজ্যে দক্ষ শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখার জন্য রাজা প্রাজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকবেন। রাজা সকল রকম বিদ্যা আয়ত্ত করবেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, “ বিদ্যাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ। অনন্যাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে সর্বভূতহিতে রতঃ।।”²⁶। যে রাজা বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হবেন এবং প্রজাদের মঙ্গল সাধনে কাজ করবেন সেই রাজার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে ও তিনি বিনা বাধায় শাসন করতে পারবেন। অন্যদিকে যে রাজা বিদ্যায় পারদর্শী নয়, প্রজাহিতৈষীমূলক কাজকর্ম করে না তাঁর পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অচিরেই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। রাজার পক্ষে তিনি ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেন যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ (গর্ব), ও হর্ষ ইত্যাদি ছয়টির প্রতি আসক্তি বর্জনের মাধ্যমেই রাজার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা জারি রাখা সম্ভব হবে। “ শত্রুঘড়বর্গমুৎসৃজ্য জামদগ্ন্যে জিতেন্দ্রিয়ঃ। অম্বরীষশ্চ নাভাগো বুভুজাতে চিরং মহীম্ ”²⁷। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমের সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিদ্যালাভের দ্বারা নিজের প্রজ্ঞা বিকশিত করবেন। নিজ শাসন দ্বারা প্রজাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উদ্যোগী করে তুলবেন। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের নিজের ধর্ম ও কর্তব্যসমূহ পালন

²⁶ বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮৬।

²⁷ তদেব, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৬, শ্লোক- ৩, ৮৯।

করবে তখনই সমাজ ও রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অনাথ ব্যক্তিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাজা গ্রহণ করবেন। এইভাবে রাজার সক্রিয় হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করাই হল রাজকার্যের সাফল্যের মূল বিষয়।

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের ধারণাকে বুঝতে হলে কৌটিল্যের আলোচনা অত্যন্ত অপরিহার্য। তৎকালীন যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি যেসব নীতি প্রণয়ন করেছিলেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রমব্যবস্থার মতো বৈদিক মতবাদকে সমর্থন করে বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের ভিত্তিতে নিজ কর্তব্যসমূহ পালনের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। সমাজের মধ্যে অপরাধ ও অন্যায় আচরণ বন্ধ করার জন্য তিনি দণ্ডনীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। কোন ব্যক্তির অধিকার যাতে বলপূর্বকভাবে অপর কোন ব্যক্তি হরণ না করে, সেজন্য তিনি দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্ব ও অপরাধীর প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে বিচারক অপরাধীকে দণ্ড দেবেন। আবার বিনিময় সংক্রান্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও যাতে সাম্যতা বজায় থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, “ বিক্রীয় পণ্যম্ অপ্রযচ্ছতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, অন্যত্র দোষোপনিপাতাবিষহ্যেভ্যঃ। সমানশচানুশয়ঃ বিক্রেতুরনুশয়েন।”²⁸। অর্থাৎ যেমন- বিক্রেতা কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে পরবর্তীকালে তা যদি দিতে না চায় তাহলে সেই বিক্রেতার দ্বাদশ পণ দণ্ড হবে। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে পণ্যদ্রব্য অনুযায়ী

²⁸ বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮৬।

নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই তা মিটিয়ে নিতে হবে। কৌটিল্যের মতে, এইভাবে বিচারক যদি সকল প্রকার প্রতারণা রহিতভাবে, অবিচলিত চিত্তে, সত্য ও ন্যায়ের সহিত সমস্ত বিবাদের সমাধান করেন তবেই তিনি সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হবেন। “এবং কার্যাণি ধর্মস্থঃ কুর্যুরচ্ছলদর্শিনঃ। সমাঃ সর্বেষু ভাবেষু বিশ্বাস্যা লোকসম্প্রিয়াঃ”²⁹। এইভাবে আইন ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা বজায় রাখা, এবং প্রত্যেকের আধিকার, সম্পত্তি ও মর্যাদা সুরক্ষার মাধ্যমে কৌটিল্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

²⁹ বন্দোপাধ্যায়(সম্পাঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম, আধ্যায়-২০, শ্লোক- ৬, ৭৩৮।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক
আলোচনা

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা

ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় যে, প্রাচ্যের মনু ও কৌটিল্যের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়েই পরিলক্ষিত হয়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উভয়েই ন্যায়বিচারকে সদৃশ্যের অন্তর্গত করেছেন। ন্যায়বিচার হল চারটি মৌলিক ধর্মের বা সদৃশ্যের (four cardinal virtues) সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি হল- প্রজ্ঞা (wisdom), সাহসিকতা (courage), আত্মসংযম (self control), ও ন্যায়বিচার (justice)। এই চারটি সদৃশ্যের মধ্যে প্রথম তিনটি যথাক্রমে মানবাত্মার তিনটি অংশের সাথে যুক্ত, এবং ন্যায়বিচার হল অপর তিনটি সদৃশ্যের সমন্বয়। সুতরাং প্লেটোর মতে, ন্যায়বিচার হল একটি সাধারণ ধর্ম – যখন আত্মার প্রত্যেকটি অংশ সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসামঞ্জস্যভাবে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে তখনই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। “Justice is a general virtue consisting in this, that every part of the soul performs its proper task in due harmony.”¹। যেহেতু সমাজ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত তাই মানুষের সাথে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে মানুষের চরিত্রের সদৃশ্যগুলি রাষ্ট্রের উন্নত রূপ হিসেবে প্রকাশ পায়। ব্যক্তির

¹ Frederick Copleston S.J, *A History of Philosophy* (Vol 1) (New York : Doubleday Dell Publishing Group, 1962), 220.

চরিত্রের মতো যখন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি শ্রেণীর নাগরিক তাদের নিজের নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে তখনই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানুষকে কেবল নৈতিকজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে না, সেই সঙ্গে নীতিনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিশেষ ধরণের জীবনচর্যাকেও অনুসরণ করতে বলে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সামাজিক দিকটি বর্ণাশ্রমধর্মের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। ‘ধর্ম’ শব্দটাকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ‘ন্যায়’ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ন্যায়’ বলতে বোঝায় কোন একটা পরিস্থিতিতে কোন কাজটি সঠিকভাবে করণীয়, তা নির্ধারণ করা। “The Hindu legal system is embedded in Dharma as propounded in Vedas, Puranas, Smritis and other works on the topic. The word Dharma is used to mean justice, i.e. what is right in a given circumstance.”²। প্রাচীন ভারতের মনু ও কৌটিল্যের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্যকর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। এবং দার্শনিক প্লেটোর মতো প্রাচীন ভারতের মনু ও কৌটিল্যের সমাজব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সমাজের মঙ্গল সাধনের কথা বলা হয়েছে। তবে প্লেটো সমর্থিত সামাজিক শ্রেণীভেদ অপেক্ষা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বর্ণভেদ প্রথাকে উন্নতমানের বলা চলে। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে শ্রেণীব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে – ১) অভিভাবক ২) প্রশাসক ও ৩) দাস শ্রেণী থাকলেও, দাস শ্রেণীকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এই শ্রেণীর কাজ হল অপর দুই শ্রেণীর আনুগত্য করা কিন্তু অপরাপর

² Sushil Kumar Mitra, *The Ethics of Hindus* (Kolkata: Calcutta University Press), 1925, 84.

শ্রেণীর তাদের প্রতি কোন কর্তব্য নেই । “.....there are three classes engaged in a kind of division of labour. There is a guardian class which rules, a class of “auxiliaries” that provide the force behind the ruling, and the class of merchants that produce to satisfy the needs and desire of the city. ”³ কিন্তু ভারতীয় বর্ণবিভাগে মানবিক এই দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়নি । চতুর্বর্ণের অন্তর্গত শূদ্র সর্বনিম্ন বর্ণের হলেও মানবাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়নি । বর্ণধর্মের পূর্বশর্তরূপে সাধারণ ধর্ম পালিত হওয়ায় সেক্ষেত্রে সব বর্ণের সব মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে । সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেমন ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণের বর্ণধর্ম পালন করতে হয়, তেমনি সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গৃহস্থাদি আশ্রমধর্ম পালন করে । এমনকি মনুসংহিতায় আমরা দেখি যে, শূদ্রের দিনযাপন যাতে ভালোভাবে হয় সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “প্রকল্প্যা তস্য তৈবৃতিঃ স্কুটুম্বাদ্ যথার্থতঃ । শক্তিধগবেক্ষ্য দাক্ষ্যধঃ ভৃত্যানাধঃ পরিগ্রহম্ ।”⁴ অর্থাৎ শূদ্রের কার্যনৈপুণ্য ও পরিবার পরিজনের সংখ্যা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তার বেতন ব্যবস্থা সঠিকভাবে করা উচিত । মনু যদিও শূদ্রকে সর্বনিম্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তথাপি তাঁর মতে শূদ্র যদি পবিত্র ও উচ্চবর্ণের প্রতি অনুগত হয়, এবং মৃদুভাষী , নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণের প্রতি সর্বদা বিনীত থাকে তবে পরজন্মে সে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করতে পারে । “শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রুমৃদুবাগনহৃৎতঃ । ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং

³ LeBar Mark and Slote Michael, “Justice as a Virtue”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue>.(accessed november, 2018).

⁴ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদঃ., মনুসংহিতা (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩), শ্লোক - ১০/১২৪, ৪২৮ ।

জাতিমশ্নুতে।।”⁵। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির মানবাধিকার রক্ষার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এবং এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শনে ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় দার্শনিক আলোচনার সূচনা প্লেটোর মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, এবং তাঁর পরবর্তীকালের দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে প্লেটোর ধারণার প্রভাব থাকলেও, কিছু মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। যেমন- প্লেটো যেখানে কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল তাঁর বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের আলোচনায় বলেন যে, কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সম্মান বা পুরস্কার প্রদান করে। “Distributive Justice is for someone to distribute to individuals goods that are taken from a common stock.”⁶ অর্থাৎ অ্যারিস্টটল প্রত্যেক নাগরিককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আবার প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে যেমন শ্রেণীবিভাজনের ধারণার কথা বলেন যেখানে উচ্চ - নিচ বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর সহানুভূতি ও সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধন করবে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল সমাজের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সাম্যতার

⁵ তর্করত্ন, সম্পাঃ. মনুসংহিতা, শ্লোক - ৮/২৮, ২৭৮।

⁶ Michael Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction* (New York: Cambridge University 2005), 196.

(equality) ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতষ্ঠার কথা বলেছেন। “In every sort of action, it’s possible to do more or less, and it’s possible as well to do what is equal. So then, if something is unjust because it’s unequal, it will be just because it’s equal.”⁷। সমাজের সকল ব্যক্তি যাতে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অ্যারিস্টটল সংশোধনমূলক ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। সংশোধনমূলক ন্যায়বিচার অনুযায়ী কেউ যদি অন্যায়ভাবে কিছু সুবিধা ভোগ করে তাহলে সংশোধনমূলক ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে সমতা বজায় রাখতে হবে। “Corrective Justice is for a judge to correct for an inequality that is created through an act of injustice, by taking goods away from the offender and restoring goods to the victim, or by simply punishing the offender.”⁸। একইভাবে সমসাময়িক দার্শনিক জন রলসের মতবাদে আমরা দেখি যে, সমাজের সকল নাগরিকের মধ্যে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার জন্য তিনি ন্যায়ের দুটি নীতির কথা বলেন –

প্রথম নীতি – সমাজের প্রত্যেকটি মানুষেরই অন্যান্য মানুষের অনুরূপ পর্যাপ্ত সমান স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে। “Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.”⁹

⁷ Pakaluk, *Aristotle’s Nicomachean Ethics An Introduction*, 197.

⁸ Ibid., 196.

⁹ John Rawls, *A Theory of justice* (London: Oxford University Press, 1972), 60.

দ্বিতীয় নীতি –ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে -১) তা যুক্তিসঙ্গতভাবে সকলের সুবিধায় আসে এবং বিশেষত সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর ব্যক্তিবর্গের সুবিধায় আসে এবং ২) মর্যাদাপূর্ণ পদ ও অবস্থান লাভের সুযোগ সকলের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করতে হবে। “Social and Economic inequalities are to be arranged so that they are both 1) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and 2) attached to position and office open to all.”¹⁰।

তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় দার্শনিক অগাস্টাইন, অ্যাকুইনাস ও কান্টের মতবাদের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। প্লেটো যেমন ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, একইভাবে কান্টও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং এজন্য তিনি কতগুলি নীতির উল্লেখ করেছেন- ১) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ (Good will alone is good)

২) কর্তব্যই কর্তব্যসাধনের লক্ষ্য (Duty for the sake of duty)

৩) নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ (Moral law is a Categorical Imperative)

কান্টের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই নীতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবেন তখনই তারা ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে। এবং এরূপ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মতো ধর্মীয় ভাবাবেগকে

¹⁰ Rawls, *A Theory of justice*, 60.

প্রাধান্য না দিয়ে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নীতি কর্তব্যবাদকে সমর্থন করে বলেন যে- কোন কর্মকে উচিত কর্ম বলা যাবে যদি তা স্বতঃমূল্যবান ও সার্বভৌম কোন নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করে, এবং যদি শুধুমাত্র কর্তব্যবোধের জন্য সেই কাজটি পালন করা হয়।

“ Human action is morally good, not because it is done from immediate inclination – still less because it is done from self-interest - but because it is done for the sake of duty.”¹¹। তবে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি

ইচ্ছার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মানুষের কর্ম যখন কেবল সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়, তখন তার ইচ্ছা স্বাধীন কেননা ঐ ইচ্ছা তার অন্ত্যঃসূত, বাহ্য-আরোপিত নয়, এবং এই সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন কর্মই কেবল নৈতিক কর্ম।

“Morality lies in the relation of actions to the autonomy of the will – that is, to a possible making of universal laws by means of its maxims. An action which is compatible with the autonomy of the will is permitted; one which does not harmonise with it is forbidden.”¹².

এক্ষেত্রে কান্টের মতবাদের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অ্যারিস্টটলও নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে বলেন যে, কোন

কর্মের ভাল-মন্দের বিচার তখনই হতে পারে যখন কর্মকর্তা নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী

কাজটি সম্পাদন করে। “Aristotle points out that it is precisely because such

action are of the agent’s own accord that we can evaluate them

¹¹ H. J. Paton, *Kant’s Grundwork of the Metaphysic of Morals* (London : Hutchinson, 1948), 19.

¹² Ibid., 101.

.....”¹³ । এইরূপে স্বেচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন ব্যক্তি ন্যায়কাজ করে তবে সেই ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে ।

মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইন ও অ্যাকুইনাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বললেও তাঁদের মতবাদের মধ্যে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের অনুকরণে অগাস্টাইন একটা ধর্মভিত্তিক সুন্দর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যে রাষ্ট্রের নাগরিকরা হবে ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে রাষ্ট্রের সঠিক বিকাশ সাধনে নিজেদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত করবে। প্লেটো ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। একইভাবে অগাস্টাইনের মতে, ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেই ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষের প্রথমে নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তির দেহ ও মনের সাথে বা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য অন্তর্নিহিত আছে তা উপলব্ধি করতে হবে। এবং অন্তরের দিব্যশক্তির দ্বারা প্রকৃতভাবে নিজেকে উপলব্ধি সম্ভব হবে একমাত্র ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা। এইরূপে ব্যক্তি যদি নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবেই সে সমাজের অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। এবং ব্যক্তি তথা সমাজের সকলের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে।

“Rightly related to God, man is properly related within himself and to

¹³ Pakaluk, *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction*, 124.

the external world of people and things. Not only thus justice produce harmony with man, peace among men, but like other moral virtues, its value lies in preparing us for the vision of God. This vision begins now with an understanding of what we believe. To the just man belongs this understanding.”¹⁴

অন্যদিকে অ্যাকুইনাস অ্যারিস্টটলীয় মতের অনুসরণে খ্রিষ্টীয় ভাবাবেগকে যুক্ত ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মতবাদের আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতো অ্যাকুইনাসও বলেন যে, ন্যায়বিচার হল এমন একটি সদৃশ্য যার দ্বারা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকে এবং যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝে দেওয়া হয়। “The virtue of justice, however, governs our relationships with others. Specifically, it denotes a sustained or constant willingness to extend to each person what he or she deserves.”¹⁵। এবং অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনিও ন্যায়বিচারকে দুটি পৃথক ভাবে বিন্যস্ত করেছেন- ক) সর্বজনীন ন্যায়বিচার ও খ) বিশেষ ন্যায়বিচার। সৎ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অ্যাকুইনাস যথেষ্ট বলে মনে করেননি, এর জন্য প্রয়োজন বিধিবদ্ধ আইনসমূহ। তিনি বলেন রাষ্ট্র হল মানুষের সঙ্গবদ্ধতার ফল, আর এই সঙ্গবদ্ধতা ঠিকমত কাজ করতে পারে না, যদি নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি না থাকে এবং এটি সম্ভব

¹⁴ Teresa Delgado, John Doody, and Kim Paffenroth, eds., *Augustine and Social Justice* (USA: Lexington Books, 2015), 14.

¹⁵ Shawn Floyd, “Thomas Aquinas: Moral Philosophy”, *The Internet Encyclopedia of philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/aq-moral>. (accessed january 2019).

কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি আইনকে সমাজকল্যাণ বাস্তবায়িত করার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। “Law is a rule or measure of acts, whereby man is induced to act or restrained from acting.”¹⁶। এদিক থেকে বলা যায় যে, ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীনযুগের আলোচনার সাথে মধ্যযুগীয় মতবাদের সমন্বয় ঘটেছে। প্লেটোও সমাজে ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন বা নিয়ম মান্য করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি ‘Crito’ তে তিনি সদৃশ একটি উপমার কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে সক্রেটিস ও তার বন্ধু ক্রিটো – এঁাদের কথোপকথানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে , অন্যায়ভাবে সক্রেটিসকে জেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বন্ধু ক্রিটো যখন তাঁকে জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে সেক্ষেত্রে সক্রেটিস তাঁর যুক্তি প্রত্যাখান করেন। কারণ তিনি মনে করেন যদিও তাঁর ক্ষেত্রে শাস্তিটা অন্যায়ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে তথাপি তাঁর আইন অমান্য করে জেল থেকে পলায়ন করা অনুচিত হবে। According to him “It is never right to do an Injustice even if you suffered an injury first”¹⁷ তাঁর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আইনের মাধ্যমেই বজায় থাকে, তাই আইন অমান্য করা অনুচিত কাজ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিজের বা পরিবারের মঙ্গলের তুলনায় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

¹⁶ Thomas Aquinas, “Law and Political Theory”, *Summa Theologiae*, ed. Thomas Gilby (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 93.

¹⁷ David Sachs, “A Fallacy in Plato’s Republic”, *The Philosophical Review* 72, 2. (1963): 141.

অন্যদিকে প্রাচ্যের মনু ও কৌটিল্যের মতবাদের মধ্যে আমরা দেখি যে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধ বা দণ্ডের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। রাজার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে – “ কুৎসং চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ । অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মন্ডলস্য চ ।।”¹⁸। অর্থাৎ রাজা পাঁচ রকমের গুণ্ডচর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখবেন, সমগ্র দ্বাদশ রাজমন্ডলের গতিবিধিও সম্যকভাবে রাজাকে জানতে হবে এবং আটপ্রকার কর্ম সম্পর্কে সম্যকভাবে পর্যালোচনা করবেন। এই আটপ্রকার কর্মের মধ্যে দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মনুর মতে, রাজার কর্তব্য হল সঠিকভাবে বিচার করা। বিচারের ফলাফল যদি এমন হয় যে, যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় নয় তাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে আর যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় তাকে দণ্ড দেওয়া হয়নি, তবে তার শাস্তি রাজাকেও ভোগ করতে হবে। “ অদণ্ডান দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাণ্য দণ্ডয়ন্ । অযশো মহাদাপ্নোতি নরাবাঞ্বেব গচ্ছতি ।।”¹⁹। একইভাবে কৌটিল্যও বিদ্যারূপে দণ্ডনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। “আস্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ড নীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ । চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ । তাভির্ধর্মার্থৌ যদ্বিদ্যাভদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্মম্ ।”²⁰ মূলতঃ কৌটিল্যের মতে, দণ্ডনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগেই রাজ্যবৃদ্ধি, রাজ্যরক্ষা, এবং রাজ্যোন্নতি সম্ভব হয়। তাঁর মতে, “ অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি । বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে । স তেন গুণ্ডঃ প্রভবতীতি ।।”²¹। অর্থাৎ রাজা যদি রাজ্যে তাঁর শাসন জারি না রাখে তাহলে রাজ্যে

¹⁸ তর্করত্ন, সম্পাঃ. মনুসংহিতা, শ্লোক – ৭/১৫৪, ২৫৩।

¹⁹ তদেব, শ্লোক – ৮/১২৮, ২১৩।

²⁰ ডঃ মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (অনুঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩), অধিকরণ-১, আধ্যায়-২, ৭৪।

²¹ তদেব, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮১।

বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, দণ্ডের অভাবে বলবান ব্যক্তি দুর্বলের উপর অন্যায়ে আচরণ করবে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যথাযথ সম্মান পাবে না, এবং প্রত্যেকে নিজ কর্তব্যে অবহেলা করবে ফলে রাজ্য তথা সমাজে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে কৌটিল্যের মতে, এই দণ্ড যথার্থভাবে প্রয়োগ করে হবে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন “তীক্ষ্ণদণ্ডো হি ভূতানামুদ্বৈজনীয়ঃ। মৃদুদণ্ডঃ পরিভূয়তে। যথার্থদণ্ডঃ পূজ্যতে। সুবিজ্ঞাতপ্রণীতো হি দণ্ডঃ প্রজা ধর্মার্থকামৈর্যোজয়তি”²²। অর্থাৎ যদি প্রজাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাহলে প্রজার রাগের পাত্র হয়ে যাবেন। আবার যদি স্বল্প দণ্ড ধার্য করেন তবে তা যথার্থভাবে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে তাই বিবেচনার সহিত যথার্থভাবে দণ্ড প্রয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ যে যেমন দণ্ড পাওয়ার যোগ্য তার প্রতি সেরকম দণ্ডের বিধান দিতে হবে। বিবেচনার সহিত দণ্ড প্রয়োগ করলে প্রজাবর্গ ধর্মপরায়ণ হয় এবং নিজ নিজ কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে।

ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মতবাদের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সকলেই একটি আদর্শ সামাজিক সংগঠন বা রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে ও কতগুলি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমাজের সকল ব্যক্তির

²² বন্দোপাধ্যায় (অনুঃ), কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, অধিকরণ-১, আধ্যায়-৪, শ্লোক- ২, ৮১।

मध्ये सामंजस्यता ॢ सामाजिक शुंखला बजाय राखार माध्यमे न्यायबिचार प्रतिष्ठा करते
चेयेछेन ।

মূল্যায়ণ

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার তুলনামূলক পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, পাশ্চাত্য ধারণায় কতগুলি আদর্শ নীতি অনুসরণ বা সমাজের মধ্যে থেকে কতকগুলি আদর্শ সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা হয়েছে। প্লেটো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন, সেই সঙ্গে তিনি শ্রেণীবিভাজনের ধারণা দিয়ে সমাজের কোন একটা শ্রেণীকে একেবারে নিম্নপর্যায়ের হিসেবে গণ্য করায় তাঁর মতবাদের মধ্যে সমাজের সকল নাগরিকের প্রতি সমতার ধারণা প্রতিফলিত না। প্লেটো, অগাস্টাইন, অ্যাকুইনাস ইত্যাদি দার্শনিকগণ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য স্বীকার করলেও, তাদের আলোচনার মধ্যে কিভাবে আইনের দ্বারা অন্যায় দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কোন মতবাদ পাওয়া যায় নি। পরন্তু বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই বিষয়টি অতীব গুরুত্ব পেয়েছে। মনু ও কৌটিল্যের আলোচনায় দেখা যায় যে, সমাজে অপরাধের হার কমানোর জন্য অপরাধীর সামাজিক অবস্থান ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যথোপযুক্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলত, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ ও ভারতীয় ধ্যান-ধারণা পর্যালোচনা করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একটি আদর্শ সমাজে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি উপায় কার্যকরী -

প্রথমত - কতকগুলি আদর্শ নীতি বা নিয়ম প্রণয়ন করা ও সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করা বা আদর্শ সামাজিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা যার দ্বারা সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গ উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের সকলের স্বার্থে কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারে। যেহেতু সমাজস্থ সকল ব্যক্তিবর্গই প্রত্যেকের কাছে কোন না কোনভাবে দায়বদ্ধ থাকে, তাই প্রত্যেকের উচিত এমন কাজ করা যাতে সমাজের সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয়। এইভাবে সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয়ত - সমাজের মধ্যে অবস্থিত যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন আছে বা যে সমস্ত নীতি অনুযায়ী সামাজিক সংগঠনগুলি পরিচালিত হয় সেগুলির মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি আছে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে সমাজের মধ্যে যেসব অন্যায় আচরণ ও অপরাধ দেখা যাচ্ছে সেগুলির যথাযোগ্য প্রতিকারের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের মতবাদগুলিতে মূলত আদর্শ নিয়ম প্রণয়ন ও আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও দ্বিতীয় দিকটির বিষয়ে সেভাবে আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মনু ও কৌটিল্যের আলোচনার মধ্যে এই দুটি বিষয়ের উপরেই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র আদর্শ ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ধারণা দিয়েই থেমে থাকেনি, সেই সঙ্গে কি কি উপায়ে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ও সমাজের মধ্যে অন্যায় দূরীকরণ করা যায় সেই বিষয়েও বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রমব্যবস্থার ধারণার কথাই বলা হয়নি, সেই সঙ্গে সাধারণধর্মের উল্লেখ করে সমাজের সকল ব্যক্তির প্রতি যে সকলের দায়িত্ব

ও কর্তব্য আছে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করার মাধ্যমে সকল নাগরিকের প্রতি সমআচরণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচ্যের ধারণায় বর্ণব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও নিম্নবর্ণের মানুষ শূদ্রের প্রতিও যে অনান্যদের কর্তব্য আছে সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এদিক থেকে বলা চলে যে, ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় ব্যক্তির মানবিক দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়নি। বিশেষ করে মনুসংহিতায় উল্লিখিত সমাজের নারীজাতির প্রতি যথাসুলভ আচরণের নির্দেশ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে এক অন্যতম রূপ দান করে। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে বিরূপ মনোভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বৃদ্ধ-বালক, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যায্য বিচার-ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে সকলে যাতে যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে সেই বিষয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা চলে যে, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আলোচনায় পাশ্চাত্যের মতবাদগুলির মধ্যে তত্ত্বগত ধারণার প্রকাশ পেলেও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র তত্ত্বগত ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়, এক্ষেত্রে তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগমূলক দিকেরও সমন্বয় ঘটেছে। তাই উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ধারণার তুলনায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণা অনেক বেশী উন্নত বলে মনে হয়।

ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜୀ

Aquinas, Thomas. "Law and Political Theory". *Summa Theologiae*, edited by Thomas Gilby, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Butts, Jain B, and Karen L. Rich. *Nurishing Ethics ; Across the Curriculum and into Practice*. USA : Jones & Bartlett Learning, 2015.

Cross, R.C, and A.D Woolzfy. *Plato's Republic: A Philosophical Commentary*. London : Macmillan, 1966.

Delgado,Teresa, John Doody, and Kim Paffenroth. *Augustine and Social Justice*. USA: Lexington Books, 1992.

Fisher, D. R. "Why Should I Be Just?". *Proceedings of the Aristotelian Society New Series*, no. 77 (1976): 35-48.

Hamedi, Afifeh. "The Concept of Justice in Greek philosophy(plato and Aristotle)". *Mediterranean Journal of Social Science* 5. no. 27 (2014): 2-9.

Havelock, Eric A. *The Greek Concept of Justice: From its Shadow in Homer to its Substance in Plato*. London: Harvard University Press, 1978.

Johnston, David. *A Brief History of Justice*. USA: Wiley-Blackwell, 2011.

Kolawole Chabi, O.S.A. "Augustine on Justice: Theory and Praxis". *An African Journal of Arts and Humanities* 1. no 2 (September 2015): 12-25.

Kraut, Richard. "Plato's Apology and Crito: Two Recent Studies". *Ethics* 91. No 4(1981): 651-64.

Lindsay, A. D. *Hume's Treatise of Human Nature with Introductions (vol-2)*. London: J.M Dent & sons Ltd, 1911.

Mandle, Jon. *Rawls A Theory of Justice An Introduction*. New York: Cambridge University Press, 2009.

Martin, Christopher. *The philosophy of Thomas Aquinas Introductory Reading*. London: Macmillan, 1988.

Mitra, Sushil Kumar. *The Ethics of Hindus*. Kolkata : Calcutta University Press, 1925.

Pakaluk, Michael. *Aristotle's Nicomachean Ethics An Introduction*. New York : Cambridge University press, 2005.

Paton, H. J. *Kant's Groundwork of The Metaphysic of Morals*. London: Hutchinson & Co Ltd, 1948.

Rawls, Jhon. *A theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1972.

Roy, Krishna, and Chhanda Gupta. *Essays In Social And Political Philosophy*. New Delhi: Allied Publishers, 1989.

Sachs, david. "A Fallacy in Plato's Republic". *The Philosophical Review* 72, no.2 (1963): 132 -151.

Singh, Shri Raghudev. "Platonic Justice : A Critical Analysis." *The Indian Journal of Political Science* 10, no. 3 (1949): 58-70.

S.J, Frederick Copleston. *A History of Philosophy (Vol 1)*. New York: Doubleday Dell Publishing Group, 1962.

খালেক, এ এস এম আব্দুল। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। ঢাকা : অনন্যা,
২০০৫।

ঘোষ, জগদীশচন্দ্র(গীতাশাস্ত্রী)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। কলকাতা : প্রেসিডেন্সী
লাইব্রেরী, ২০১০।

তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন, (সম্পাঃ)। মনুসংহিতা। কলকাতা : সংস্কৃত
পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু, (সম্পাঃ)। মনুসংহিতা। কলকাতা : সদেশ,
২০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু, (সম্পাঃ)। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম। কলকাতা:
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১।

Fieser, James, and Dowden Bradley. "Thomas Aquinas Moral Philosophy". *The Internate Encyclopedia of philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/aq-moral>. (accessed january 2019).

Floyd, Shawn. "Thomas Aquinas: Moral Philosophy". *The Internate Encyclopedia of philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/aq-moral>. (accessed january 2019).

LeBar, Mark, and Michael Slote. "Justice as a Virtue". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue>. (accessed november, 2018).

Maiese, Michelle. "Principles of Justice Fairness". Goy Burgess and Heidi Burgess (ed), University of colorado, Boulder, 2003. [http://www.beyondintractability.org/essey/principles of justice](http://www.beyondintractability.org/essey/principles_of_justice). (accessed november 2, 2018).

Miller, David. "Justice". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/justice>. (accessed november 2, 2018).

Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica* . <https://archive.org>.(accessed january 2019).

Two Day National Seminar

on

Mind, Reality and Society : Philosophical Reflections

Organised by

**Department of Philosophy
Centre of Advanced Study
Jadavpur University**

This is to certify that Dr./Sri/Smt. *Nazrin E-Perdous*
of the Department of *Philosophy*
has ~~actively participated/~~ presented a paper on *The Concept of
Justice (A Philosophical Analysis)*
at a National Seminar on "Mind, Reality and Society: Philosophical Reflections"
organized by the Department of Philosophy, Centre of Advanced Study, Jadavpur
University, Kolkata, held on 23rd & 24th March, 2018.

L. Chandru
Dr. Lopamudra Choudhury
Professor of Philosophy

Samar K. Mondal
Dr. Samar Kumar Mondal
Associate Professor
of Philosophy

Preetam Ghoshal
Dr. Preetam Ghoshal
Associate Professor
of Philosophy

Chatterjee
Professor Atashee
Chatterjee Sinha
H.O.D. Philosophy

(Jt. Co-ordinators of the Seminar)

P. Sarkar
Professor Proyash Sarkar
Deputy Coordinator, CAS